বিজ্ঞান মেলা

আগস্ট ১৯৮১ ● শ্রাবণ ১৩৮৮
একটাকা

ছোটদের জন্য বাংলাভাষায় প্রথম মাসিক বিজ্ঞান পত্রিকা

প্রেমেন্দ্র মিত্র ও নিরঞ্জন সিংহের বিজ্ঞান-ভিত্তিক গল্প

ধারাবাহিক ঃ সূর্যপাড়ি (ছবিতে কল্প কাহিনী) ও রোবোস (সায়েন্স ফিক্‌সন্‌)

বিজ্ঞান ফিচার ॥ মেঘে মেঘে বিদ্যুৎ/ইলেক্‌ট্রিসিটির গোড়ার কথা/রক্তচাপের রেগুলেটর/ভয় এড়ানোর উপায়/বিজ্ঞানাচার্য প্রফুল্লচন্দ্র/এবং······?

পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি দিয়েছেন - সুজিত কুণ্ডু
স্ক্যান করেছেন - সুজিত কুণ্ডু
এডিট করেছেন - অপ্তিমাস প্রাইম

একটি আবেদন

আপনাদের কারোর কাছে যদি কোন পত্রপত্রিকার কোন বিশেষ সংখ্যা থাকে এবং আপনি সেটা আমাদের স্ক্যান করতে দিতে চান কিংবা নিজে স্ক্যান করে দিতে চান তাহলে নিচের ইমেইল এ যোগাযোগ করুন

dhulokhela@gmail.com

‘বিজ্ঞান মেলা’র নিয়মাবলী

- ইংরাজী মাসের পয়লা তারিখে কাছের পত্রিকা ষ্টলে ‘বিজ্ঞান মেলা’ পাওয়া যায়। দাম প্রতি সংখ্যা এক টাকা।
- গ্রাহকরা ঘরে বসেই ডাকযোগে ‘বিজ্ঞান মেলা’ পায়। এজন্য ডাক-মাশুল দিতে হয় না। সারা বছরের গ্রাহক হলে ১২ টাকা। গ্রাহকরা সারা বছর হাতে পত্রিকা নিলে ২ টাকা কম লাগবে।
- গ্রাহক হতে হলে সম্পাদকের দপ্তরে ১২ টাকা মনিঅর্ডার করে পাঠাতে হবে। মনি অর্ডার স্লিপে পরিষ্কার করে নিজের নাম-ঠিকানা লিখে দিতে হবে।
- নতুন লেখকদের বিজ্ঞানের যে কোন বিষয়ে লেখা প্রকাশের সুযোগ দিচ্ছে ‘বিজ্ঞান মেলা’। তবে ‘লেখা’ অবশ্যই কিশোর-কিশোরীদের উপযোগী এবং সম্পাদকমণ্ডলীর বিচারে মনোগ্রাহী হওয়া চাই। লেখার সঙ্গে অবশ্যই উপযুক্ত ডাকটিকিট পাঠাতে হবে।
- ধাঁধা/শব্দকূটের উত্তর যত শীগ্‌গীর সম্ভব পাঠানোই ভাল।
- ‘বিজ্ঞান মেলা’র এজেন্ট হতে গেলে কমপক্ষে ৫ কপি নিতে হবে।

  কমিশন—টাকায় ২৫ পয়সা। মফঃস্বলে এজেন্টদের রেজিষ্ট্রি ডাকে পত্রিকা পেতে হলে কমপক্ষে ২৫ কপির দাম (কমিশন বাদে) অগ্রিম পাঠাতে হবে।

—বিশেষ ঘোষণা—

ডঃ বিনোদ বিহারী নিয়োগী (হাবড়া ২৪ পরগণা) স্মৃতি প্রতিযোগিতা

বিষয় : বিজ্ঞানের কোন স্মরণীয় আবিষ্কার (২৫০ শব্দের মধ্যে)

১০ থেকে ১৭ বছর বয়সের যে কেউ এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারে।

লেখা পাঠাবার শেষ তারিখ : ৩১শে আগষ্ট ১৯৮১

প্রথম পুরস্কার—২৫ টাকা
দ্বিতীয় „ —১৫ টাকা
তৃতীয় „ —১০ টাকা

পুরস্কার দাতা :
শিশিরকুমার নিয়োগী
কলিকাতা-৭০০০৩৭

বিজ্ঞান মেলা—বাংলায় ছোটোদের জন্য প্রথম মাসিক বিজ্ঞান-পত্রিকা। বেরোচ্ছে প্রতি ইংরাজী মাসের একদম গোড়ায়।

সম্পাদকীয় দপ্তর

৫৩-সি, মতিলাল নেহেরু রোড
কোলকাতা-৭০০০২৯
ফোন—৪৭-৬৯৮০

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ১২ টাকা (সডাক)

সম্পাদকমণ্ডলী (সাম্মানিক)

সুভাষ সান্যাল
কৃষ্ণা ঘোষাল
সুভাষ দাস

সম্পাদক (সাম্মানিক)

অমিত চক্রবর্তী

মৃণালকান্তি সাহা কর্তৃক ৮/৫, হিঙ্গন জমাদার লেন, কোলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে প্রকাশিত এবং সত্যনারায়ণ প্রেস, ১, রমাপ্রসাদ রায় লেন, কোলকাতা-৭০০০০৬ থেকে মুদ্রিত।

বিজ্ঞান মেলা

আগস্ট ১৯৮১ * শ্রাবণ ১৩৮৮

চিত্রে কল্পকাহিনী/সূর্যপাড়ি | ২২৭

ছড়া

লিমেরিক | প্রদীপ রায় ২২৯

গল্প

পিঁপড়ে পুরাণ | প্রেমেন্দ্র মিত্র ২৩৮
কে আমি ? | নিরঞ্জন সিংহ ২৪০

সায়েন্স-ফিক্‌সন্

রোব্বোস | হীরেন চট্টোপাধ্যায় ২৩৩

জ্ঞান-বিজ্ঞান

মেঘে মেঘে বিদ্যুৎ | ২২৮
সাপ নিয়ে কিছু প্রশ্ন | ২৩০
অ্যাসিড বৃষ্টি ! | জীবন ভৌমিক ২৪২
বিশ্ব জুড়ে বিচিত্র প্রাণ | কৃষ্ণা ঘোষাল ২৪৭
ইলেকট্রিসিটির গোড়ার কথা | সুজয় বসু ২৫০

বিজ্ঞানী

স্বদেশী শিল্পের জনক | ভবেশ দত্ত ২৩১

নিয়মিত বিভাগ

বিজ্ঞানের খবর ২২৬ জানো কি ? ২৪৯ শরীর-স্বাস্থ্য ২৪৫
মনের জানালা ২৫৩ পড়ুয়ার দপ্তর ২৫১
ছড়া প্রতিযোগিতার ফলাফল ২৫৫ ধাঁধা ২৫৬

প্রচ্ছদ | **শুভাপ্রসন্ন** / মনোজ বিশ্বাস
অলঙ্করণ | **কল্যাণ চক্রবর্তী**

খবর

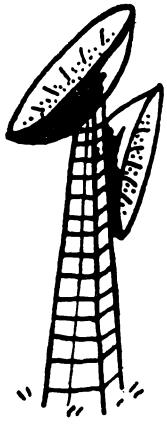

পশুপাখীর ভাষা

পশুপাখীরা আমাদের মত কথা বলতে পারে না এটা সত্যি, তাই বলে তারা যে মনের ভাবের আদান প্রদান করতে পারে না—তা নয়। ওরা ওদের ভয়, বিরক্তি, রাগ —এসব একে অপরকে জানিয়ে দেয় বিশেষ কতকগুলি সংকেতের মধ্যে দিয়ে। মৌমাছিদের উপর পরীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে; তারা নাচের বিভিন্ন ভঙ্গী করে কতদূরে কোন্ গাছের ফুলে মধু রয়েছে—তা সঙ্গীদের জানিয়ে দেয়। হনুমানদের ব্যাপারটা তো আরও মজার।

পূর্ব আফ্রিকার এক বিশেষ প্রজাতির হনুমানদের আচার ব্যবহার লক্ষ্য করে দেখা গেছে—এরা পাইথন বা ময়াল সাপ দেখতে পেলে বিশেষ এক ধরণের চীৎকার করে সঙ্গীসাথীদের সাবধান করে দেয়। ঈগল পাখী কিংবা চিতাবাঘ দেখলেও এরা চীৎকার করে—তবে তার আওয়াজটা একেবারে অন্যরকম। হনুমানদের বিভিন্ন সময়ের চীৎকার রেকর্ড করে গাছের আড়াল থেকে পরে তা বাজানোর সময়ে এদের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা হয়। সাপ দেখলে এরা যেভাবে চীৎকার করে তা যখন ওদের আবার শোনানো হয় তখন দেখা গেল, দলবল সমেত যাবতীয় হনুমান উঠে গেছে গাছের একেবারে মগডালে! আবার চিতাবাঘের সংকেত শুনে সবাই গিয়ে লুকলো ঘন ডালপালার আড়ালে। আর ঈগলের সংকেত শুনে সব্বাই লুকিয়ে পড়লো মাটির কাছাকাছি।

গাছ থেকে প্ল্যাষ্টিক ?

প্ল্যাষ্টিক কিসের থেকে তৈরী হয় জানো তো? পেট্রোলিয়াম বা কয়লার অংশবিশেষকে—অর্থাৎ কিছু কিছু হাইড্রোকার্বনের দলকে তাপ আর চাপের নানা কাণ্ড-কলাপের মধ্যে পাঠিয়ে তৈরী হয় প্ল্যাষ্টিক।

কিন্তু সমস্যা হলো যে দিনের দিন কয়লা আর পেট্রোলের ভাঁড়ার ফুরিয়ে আসছে। যথেচ্ছভাবে তো আর ঐসব জিনিষ খরচ করা চলবে না। হাল আমলে ইংরেজ বিজ্ঞানীরা গাছকে প্ল্যাষ্টিক তৈরীর কাজে লাগাচ্ছেন বলে শোনা যাচ্ছে। গাছেদের শরীরে আছে প্রচুর সেলুলোজ। এই সেলুলোজকে কাজে লাগিয়ে তৈরী করা হচ্ছে সেলো-ডেক্সট্রিন—যার থেকে তৈরী করা হবে···প্ল্যাষ্টিক। আরে না না—এর জন্য গাছ কেটে নষ্ট করতে হবে না। চিনির জন্য আখ মাড়াই-র পরে ফেলে-দেওয়া ছিবড়ে থেকেই দিব্যি প্ল্যাষ্টিক বানান যাবে। বেশ অভিনব চিন্তা—তাই না?

চাঁদনী রাতের মথের দল!

'সেদিন রাতে স্পষ্ট চোখে দেখনু বিনা চশমাতে
পান্তভূতের জ্যান্ত ছানা করছে খেলা জ্যোৎস্নাতে।'

—সুকুমার রায়ের কথামতো পান্তভুতের জ্যান্ত ছানারা চাঁদনী রাতে খেলা করে কিনা জানা নেই তবে বিজ্ঞানীরা দেখেছেন চাঁদনীরাতে নিশাচর মথেদের ছোটাছুটি বেড়ে যায়। দুই খ্যাতনামা পতঙ্গবিজ্ঞানী—ডঃ ডি ডন্থনারায়ন এবং ডঃ ষ্টিফেন গুডউইন দেখছেন—চাঁদনীরাত হলেই হাল্কা বাদামী রঙের এক জাতের মথ আর ব্ল্যাক ডায়ামণ্ড জাতের মথেরা ডানা মেলে উড়তে আরম্ভ করে। বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে দেখেছেন ঐ বিশেষ প্রজাতির মথেরা নীল আলোয় বেশী আকৃষ্ট হয়। মজার কথা হলো চাঁদের আলোয় (কিংবা চাঁদ থেকে সূর্যের প্রতিফলিত আলো যাই বলো না কেন!) নীল ঘেঁষা তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের দলই বেশী। বিজ্ঞানীদের মাথায় এখন ভাবনা ঢুকেছে নীল আলো দেখিয়ে মথ ধরায় ফাঁদ পাতা যায় কি না?

সূর্যপাড়ি

(রুশ কল্পকাহিনী অবলম্বনে)

(এরপর আগামী সংখ্যায়)

মেঘে মেঘে বিদ্যুৎ

আকাশ জুড়ে কালো মেঘের ভীড়—মাঝে মাঝে বিদ্যুতের ঝলক তারপরই বিকট আওয়াজ। ভয় লাগে না? মনে হয় বড়দের একটু গা ঘেঁষে থাকাই নিরাপদ।

কিন্তু বিদ্যুৎকে সত্যিই ভয় পেও না। ব্যাপারটা কেন ঘটে একটু বোঝার চেষ্টা কোরো। তাহলে দেখবে সব ভয় কোথায় পালিয়ে গেছে।

দুটো-মেঘ যদি কাছাকাছি আসে, আর সে মেঘের গায়ে গায়ে যদি অজস্র তড়িৎকণার ভীড় থাকে, তাহলে বিপুল পরিমাণ তড়িৎকণা এক মেঘ থেকে অন্য মেঘে ছুটে যায়। আমরা এই তড়িৎ কণাদের ছুটোছুটি দেখি কয়েক ঝলক আলো হিসেবে। এই আলোকেই বলি 'বিদ্যুৎ'। সাধারণতঃ মেঘের ওপর দিকে থাকে পজিটিভ বা ধনাত্মক তড়িৎকণারা আর নীচের দিকে নেগেটিভ বা ঋণাত্মক তড়িৎকণারা।

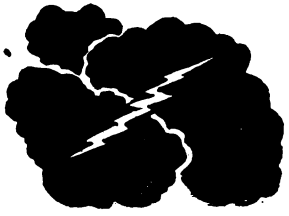

মেঘের তলার দিকে তড়িৎকণাদের ভীড় যখন খুব বেড়ে যায়—তখন তারা পালিয়ে যাওয়ার পথ খোঁজে। তড়িৎকণাদের প্রভাব মেঘ আর মাটির মধ্যে তৈরী হয় তড়িৎক্ষেত্র (ইলেকট্রিক ফিল্ড)। মেঘের বুকে প্রচুর তড়িৎকণাদের ভীড়, পৃথিবীর মাটিতে একদম মুক্ত তড়িৎকণা নেই। এই অসমতার দরুণ মেঘ থেকে মাটির দিকে তড়িৎকণারা খুব তাড়াতাড়ি ছুটে পালিয়ে আসতে চায়।

অবশ্য এর জন্য চাই একটু ভিজে বাতাস, নইলে এরা নামতে পারে না। সে যাই হোক, বাতাসের সিঁড়ি বেয়ে এরা যখন মাটিতে একসঙ্গে নেমে আসে, আমরা বলি—বাজ পড়েছে। এদের এই নেমে আসার ব্যাপারটাও বেশ মজার। একদল ইলেকট্রন বা ঋণাত্মক তড়িৎকণা মেঘ থেকে ঝাঁপ দেয় বাতাসের বুকে। বাতাসের বুকে শুরু হয় ধাক্কাধাক্কি, খানিকদূরে গিয়েই ইলেকট্রনের প্রথম দলের শক্তি যায় ফুরিয়ে। তখন যাত্রা শুরু করে ইলেকট্রনের দ্বিতীয় দল। এইভাবে ধাপে ধাপে ছুটতে ছুটতে ইলেকট্রনের দল মাটিতে পৌঁছায়। মেঘের গা থেকে যাত্রা শুরু করে এদের মাটিকে ছুঁতে সময় লাগে এক সেকেণ্ডেরও অনেক অনেক কম। এক নিমেষে কত লাখ ইলেকট্রন যে মেঘ থেকে মাটিতে নামে তার হিসেবে করাই মুস্কিল!

দেখেছ নিশ্চয়ই, উঁচু বাড়ীর ছাদের কোণে কোণে সরু লোহার শলাকা লাগানো থাকে; ওটা বাজের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যে। আসলে ছুঁচলো কোন জিনিষ পেলে ইলেকট্রনরা তার দিকেই ছুটে যায় আগে। অনেক সময়ই গাছে বাজ পড়ে কারণ উঁচু বাড়ীর ছাদের লোহার শলাকাদের মতই গাছেরা মেঘ থেকে ছুটে আসা তড়িৎ কণাদের আকর্ষণ করে। তাই বেশী বিদ্যুৎ চমকালে গাছতলায় দাঁড়ানো তেমন নিরাপদ নয়। অবশ্য বাড়ীর ছাদের ঐ ছুঁচলো লোহার শলাকা থেকেও বিপদ যখন তখন আসতে পারে। যদি খুব বেশী সংখ্যক ইলেকট্রন মেঘ থেকে নেমে আসে তাহলে নিয়ম মতো ঐ লোহার শলাকা বেয়ে সেগুলো চট্‌পট্ মাটিতে পৌঁছতে পারে না।

আকাশে বেশী বিদ্যুৎ চমকাতে দেখলে আর সেই সঙ্গে হাওয়াটা একটু ভিজে থাকলে গাছতলায় বা বেশী ভীড়ে গা ঘেঁষাঘেষি করে দাঁড়িও না। ভুলেও ছাতা খুলো না। ছাতার সূঁচালো ধাতুর মুখ বিপদ ডেকে আনতে পারে। তবে বিদ্যুতের ঝিলিক দেখতে পেলে আর কোনও ভয় নেই। কারণ শব্দটা কানে পৌঁছয় আসল ঘটনার অনেক পরে।

ছড়া

লিমেরিক

প্রদীপ রায়

খক খক কেশে চলে বিজ্ঞানী মণ্ডল,
'ওরে খোকা শীগগিরী আন দেখি নুন জল।'
টক দই নিয়ে ছেলে
দিল কিছু ক্ষার ফেলে
এক গ্লাস এনে বলে, 'করে ফেল গারগল' ॥

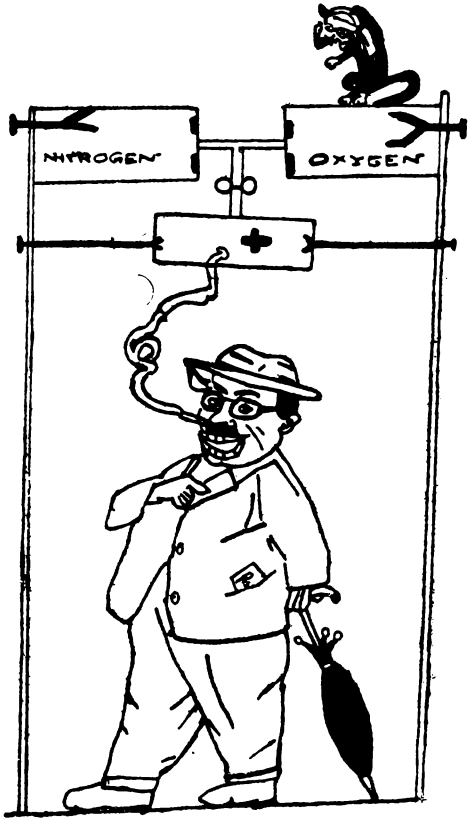

কিঞ্চিদধিক গন্ধ শুঁকেই পাচ্ছে হাসি, বাঁকছে কস,
করছ এ গ্যাস ক্যামনে, সেডা কষ্ট করে কওনা বস ?
'দুইটি বোতল নেত্রজানে
আরেক বোতল অক্সি-দানে
ল্যাব্রেটরীর চাদুই আনে বোতল দুয়েক হাস্যরস' ॥

গত মাসের বিজ্ঞান মেলায় বিষধর ক্ষীণবিষ এবং নির্বিষ সাপেদের সম্বন্ধে কিছু কিছু তোমরা জেনেছো। সাপ নিয়ে যে অহেতুক ভুল-ভ্রান্তি ভয় আছে বেশীর ভাগ সময়ই দেখা যায় তা অমূলক। সাপ এবং সাপের কামড় নিয়ে কিছু সাধারণ প্রশ্ন ও তার উত্তর এই পাতায় দেওয়া হল।

সম্পাদক/বিজ্ঞান মেলা

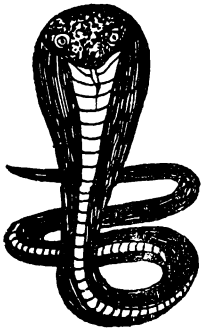

সাপ নিয়ে কিছু প্রশ্ন

কামড়ের দাগ দেখে সাপ সম্বন্ধে ধারণা করা যায় কি না?

—নিশ্চয় যায়। বিষধর সাপ কামড়ালে একটা বা দুটো দাঁতের গভীর দাগ ক্ষতস্থানে পড়বে। কিন্তু নির্বিষ সাপের দাঁতের দাগ অনেকগুলো ছোট ছোট আঁচড়ের মতো। ক্ষতস্থান দিয়ে রক্ত চোঁয়ায় না বা ফুলে ওঠে না।

কোন বিশেষ তিথিতে বিশেষ সাপ, যেমন ঢোঁড়া, বিষধর হয়ে ওঠে কি?

—বছরের মধ্যে সময় বিশেষে বিষধর সাপের বিষ কমলে বা বাড়লেও, নির্বিষ সাপেদের ক্ষেত্রে কিন্তু এ ব্যাপারটা কোন সময়ই ঘটে না। তবে বিষধর সাপেদের বিষ কমুক বা বাড়ুক, সব সময়ই সতর্ক থাকা উচিত—কারণ খুব সামান্য পরিমাণ সাপের বিষই মানুষ বা অন্য জীব-জন্তুর মৃত্যুর কারণ হতে পারে।

সাপের বিষ কি রক্ত বিষিয়ে দিয়ে মৃত্যু ডেকে আনে?

—এক এক সাপের বিষ এক একভাবে কাজ করে। যেমন ধরো কেউটে, শাঁখামুটি বা চিতির বিষে স্নায়ুতন্ত্র অবশ হয়ে যায়, চোখ খুলতে কষ্ট হয়—অক্সিজেনের অভাবে মুখচোখ নীলচে হয়ে যায়।

আবার চন্দ্রবোড়া ধরনের সাপের বিষ রক্ত সংবহন তন্ত্রের ওপর কাজ করে। এই বিষের প্রভাবে রক্ত জমাট বাঁধার ক্ষমতা কমে যায়, নাক, মুখ বা প্রস্রাব-পায়খানার সাথে সাথে রক্তপাত ঘটতে পারে। এর সঙ্গে কাঁপুনি বা কনভাল-শান শুরু হয়, রক্তচাপ কমে শেষমেষ হৃদযন্ত্রের কাজকর্ম বন্ধ হয়ে মৃত্যু ডেকে আনে।

সাপে কামড়ালে কি ক্ষতস্থানে চিরে দেওয়া, বাঁধন দেওয়া বা ওঠবোস করা উচিত?

—ক্ষতস্থান চিরতে যাবে কেন? বিষধর সাপে কামড়ালে ক্ষত অনেকটা গভীর হয়ে বিষ রক্তে মেশে, ক্ষতস্থান কেটে দিয়ে কি বিষটা বার করা সম্ভব? উল্টে ব্লেড দিয়ে কাটা বা পুড়িয়ে দেবার ফলে ক্ষতস্থান বিষিয়ে যেতে পারে।

সাপে কামড়ালে বাঁধন দেওয়ার দরকার আছে—বিশেষতঃ যদি কামড়টা পড়ে হাতে বা পায়ে।

বাঁধনের ফলে শরীরে রক্ত চলাচল এবং অক্সিজেন সরবরাহ দুই-ই কমে, সুতরাং খুব কষে অনেকক্ষণ বাঁধন দিয়ে রাখলে জায়গাটা ভবিষ্যতে পচে যেতে পারে। বাঁধন দিতে হবে এমনভাবে যাতে শিরায় রক্ত চলাচল বন্ধ হয়, কিন্তু ধমনীর নয়। বিশ-পঁচিশ মিনিট বাদে বাদে একবার এক-আধ মিনিটের জন্য বাঁধন ঢিলে দিয়ে আবার বাঁধতে হবে। রোগীকে একদম ওঠবোস করান চলবে না। শরীরটা স্থির রাখতে হবে। এর ফলে ফোলাও কমবে, রক্তপাতও বন্ধ হবে, বিষও রক্তে মিশবে কম।

'অ্যান্টিভেনিন' জিনিষটা কি?

সাপে কামড়ানোর একটাই বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা আছে। সেটা হলো 'অ্যান্টিভেনিন'—অর্থাৎ সাপের বিষের ওষুধ ইনজেকশন দেওয়া। প্রথমে বিভিন্ন ধরনের সাপের বিষ সংগ্রহ করে সেই বিষ খুবই সামান্য মাত্রায় ভেড়া বা ঐ ধরনের কোন পশুর শরীরে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। বিষের ক্রিয়ার দরুণ ঐ জন্তুর রক্তে প্রতিবিষ তৈরী হতে থাকে যার নাম অ্যান্টিভেনিন। বিশেষ কতকগুলো পদ্ধতির মাধ্যমে রক্ত থেকে অ্যান্টিভেনিন-কে আলাদা করে চিকিৎসার কাজে লাগানো হয়ে থাকে।

স্বদেশী শিল্পের জনক : আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র

ভবেশ দত্ত

বিজ্ঞানী

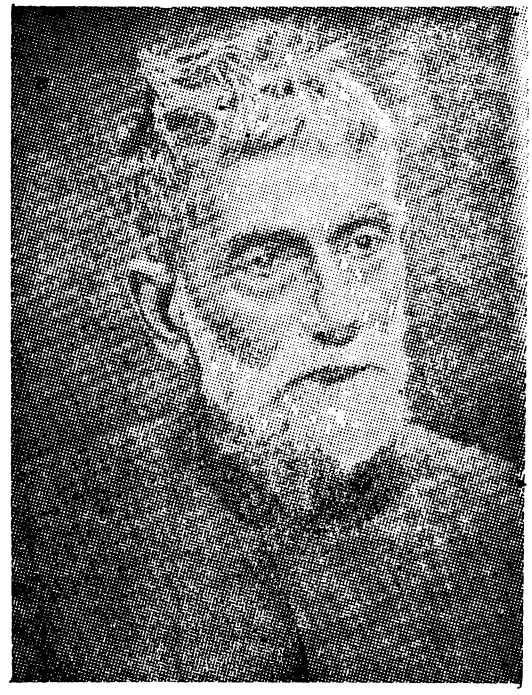

১৮৯৫ সাল। ভারতবর্ষে রসায়ন শাস্ত্র পঠনপাঠনের সেটা একেবারে গোড়ার যুগ। কলকাতায় প্রেসিডেন্সী কলেজে তখন অধ্যাপনা করেন এক বাঙ্গালী রসায়নবিদ। এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি. এস. সি প্রেসিডেন্সী কলেজের ওই অধ্যাপক শুধু অধ্যাপনাতেই নয় সেইসঙ্গে রসায়নের মৌলিক গবেষণায়—বিশেষ করে দুর্লভ কিছু ভারতীয় ধাতু বিশ্লেষণের কাজে তখন ভীষণ ব্যস্ত। এই সময়েই ঘটলো এক অভাবনীয় কাণ্ড! উনি আবিষ্কার করলেন 'মারকিউরাস নাইট্রাইট'। পারদজাত যৌগিক পদার্থ সম্বন্ধে তখনকার রসায়নবিদদের ধারণা ছিল অস্পষ্ট। সুতরাং রাতারাতি পৃথিবীর বাঘা বাঘা রসায়নবিদদের মহলে আলোড়ন তুললেন এই ভারতীয় বিজ্ঞানী। ইংল্যাণ্ড আর ফ্রান্সের পয়লা সারির বিজ্ঞানীরা একবাক্যে স্বীকার করলেন—ভারতীয় বিজ্ঞানী ডঃ পি সি রায় তাঁর 'মারকিউরাস নাইট্রাইট প্রস্তুত-পদ্ধতি' আবিষ্কারের মধ্যে দিয়ে তাঁদের জ্ঞান ভাণ্ডারকে করেছেন পরিপূর্ণ। আজ এই মুহূর্তে আমরা হয়তো বুঝবো না—এটা ছিল কতবড় সম্মান, শুধু তো সেই ডঃ পি সি রায়েরই নয়, সেই সঙ্গে পরাধীন ভারতবর্ষেরও। প্রাচীন ভারতবর্ষের বিজ্ঞান চর্চায় ঐতিহ্য—ভাস্করাচার্যের পরে যা স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলো বহু দিনের জন্য—উনবিংশ শতাব্দীর শেষে তাকে ফিরিয়ে আনতে পেরেছিলেন যাঁরা—ডঃ পি সি রায়কে তাঁদের পুরোধা বলা যেতে পারে।

ডঃ পি সি রায় বলাটা ঠিক হচ্ছে না। আমরা চিনি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়কে—যিনি শুধু বিজ্ঞানী নন; সেই সঙ্গে ছাত্র অন্তপ্রাণ এক মহান শিক্ষক। শিল্পব্যবসায়ের পথিকৃত—অপরের জন্য নিঃস্ব হয়ে যাওয়া এক সমাজসেবী।

মাত্র ৮০০৲ নিয়ে প্রফুল্লচন্দ্র শুরু করেছিলেন বেঙ্গল কেমিক্যাল। কিভাবে তা শুরু হয়েছিল সে গল্পই তোমাদের এখন বলি। সময়টা ছিল উনবিংশ শতাব্দীর শেষ—বিংশ শতাব্দীর শুরু। ভারত তখন পরাধীন। প্রফুল্লচন্দ্র সেইসময় ভাবছেন—সবকিছুই বিদেশ থেকে আনতে হবে? আমরা ভারতীয়রা কেন এসব জিনিষ তৈরী করতে পারব না? প্রফুল্লচন্দ্র নিজের বাড়ীতেই কাজ শুরু করলেন। প্রথম পরীক্ষায় লেবুর রস থেকে 'সাইট্রিক অ্যাসিড' তৈরী হল। প্রফুল্লচন্দ্র ঠিক করলেন—লেবুর রস থেকে সাইট্রিক অ্যাসিড তৈরী করে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে বাজারে বিক্রি করবেন। তৈরী হবে একটি রসায়নশিল্প। কিন্তু বাজারে গিয়ে লেবুর দরদাম করে বুঝলেন, চলতি দামে লেবু কিনে তা থেকে সাইট্রিক অ্যাসিড তৈরী করতে অনেক খরচ পড়বে, লাভ করার কোন আশা নেই। আবার চিন্তা শুরু হল। কম খরচে অল্প পরিমাণে কি তৈরী করা যায়, বাজারে যে জিনিষের যথেষ্ট কাটতি আছে? অনেক ভাবনার পরে প্রফুল্লচন্দ্র স্থির করলেন—ওষুধ সংক্রান্ত জিনিষ তৈরী করবেন। ব্রিটিশ ফার্মাকোপিয়ার বিভিন্ন ওষুধ নিজে তৈরী করতে গিয়ে দেখলেন, সালফিউরিক অ্যাসিড অন্যান্য বহু শিল্পের প্রধান উপাদান। অগত্যা

সালফিউরিক অ্যাসিডের খোঁজখবর করতে তাঁর এক বন্ধুর সঙ্গে একটি কারখানায় গেলেন। কারখানাটি তখন ছিল টালিগঞ্জের তিন মাইল দক্ষিণে বাঁশবনের মধ্যে। প্রফুল্লচন্দ্র দেখলেন সেখানে মিস্ত্রীরা ১০ × ১০ × ৭ সিসার ঘরে সালফিউরিক অ্যাসিড তৈরী করছে। মাটির জালায় চোঁয়ানো হচ্ছে সালফিউরিক অ্যাসিড, হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড। তখনই প্রফুল্লচন্দ্র স্থির করলেন—আধুনিক সালফিউরিক অ্যাসিডের কারখানা গড়ে তুলবেন এবং পরে বেঙ্গল কেমিক্যালে তা করেও গেছেন। বিভিন্ন রাসায়নিক জিনিষ তৈরী করার কথা চিন্তা করে প্রফুল্লচন্দ্র ঠিক করলেন—ফসফেট অফ্ সোডা, সুপার ফসফেট অফ্ লাইম তৈরী করবেন, তার জন্য কয়েক বস্তা গরুর হাড় সংগ্রহ করে নিজ বাড়ীর ছাতে শুকোতে দিলেন। একে গরুর কাঁচা হাড়ের দুর্গন্ধ, তার উপরে কাক আর পাখী সেই হাড় নিয়ে অন্যান্য বাড়ীতে ফেলতে লাগল। পাড়ার লোকেরা রেগে গিয়ে প্রতিবাদ করলো—পুলিশ ডাকবে বলেও শাসালো। প্রফুল্লচন্দ্র তখন হাড়গুলি মাণিকতলার মুরারিপুকুরে নিয়ে গিয়ে তাই থেকে সুপারফসফেট্ অফ্ লাইম তৈরী করলেন। এমনি করে প্রফুল্লচন্দ্রের বাড়ীর ঘরে ও ছাতে যে কাজের সূচনা তা'ই মূর্তি পরিগ্রহ করে ভারতের প্রথম রসায়ন ও ভেষজ শিল্প—বেঙ্গল কেমিক্যালে। ভারতে প্রথম রসায়নশিল্প সূচনা করার পরে তিনি আত্মনিয়োগ করেন ভারতের প্রথম এনামেল ও চীনামাটির শিল্প স্থাপনের প্রয়াসে—তিনি বাণিজ্য পোত ও ব্যবসার সঙ্গেও নিজেকে যুক্ত করেছিলেন।

রাজ্যের প্রয়োজনে আরও বিদ্যুৎ

রাজ্যের বর্তমান বিদ্যুৎ সঙ্কট সম্বন্ধে আমরা সম্পূর্ণ সচেতন। যদিও খুব অল্প সময়ের মধ্যে এই সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয় তবুও এই সঙ্কট মোকাবিলায় সম্ভাব্য সবরকমই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। ১৯৭৮ সালে সাওতালডিহির ১২০ মেগাওয়াট বিশিষ্ট তৃতীয় প্রকল্প এবং এ বছর ১২০ মেগাওয়াট বিশিষ্ট চতুর্থ প্রকল্পটি চালু করা হয়েছে। এরূপে গত চার বছরের মধ্যে আরও কয়েকটি ছোট ছোট নতুন বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র চালু করে প্রায় ৩৫০ মেগাওয়াট উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ানো সম্ভব হয়েছে। নতুবা বিদ্যুৎ সঙ্কট আরও তীব্র হ'ত।

ব্যাণ্ডেলের পঞ্চম ইউনিট (২১০ মেগাওয়াট) ও কোলাঘাটের তিনটির প্রতিটি ২১০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন প্রকল্পগুলির কাজ দ্রুত শেষ করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্পগুলির কাজ শেষ হলে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা আরও ৮৪০ মেগাওয়াট বেড়ে যাবে। কোলাঘাটের দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ শুরু করার জন্য সরকারের অনুমোদন কিছুদিন পূর্বে পাওয়া গিয়েছে। যার দরুণ এ রাজ্যে আরও ৬৩০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ বাড়ানো সম্ভব হবে। এ কাজেও যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হাত দেওয়া হবে।

ভবিষ্যতের বর্ধিত চাহিদার ভিত্তিতে নতুন পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হচ্ছে। রাজ্যের উত্তরাঞ্চলে জেলাগুলির জন্য পার্বত্য নদীগুলি থেকে আরও বেশী পরিমাণে জল বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা চলছে।

এই সমস্ত পরিকল্পনাগুলির রূপায়ণে সকলের সহযোগিতা আমাদের কাম্য।

বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্য পূরণে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ্

ধারাবাহিক সায়েন্স ফিকসন

Endo Binder রচিত Adam Link's Vengeance গল্পের ছায়াবলম্বনে

রোবোবাস

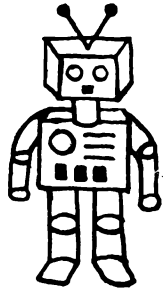

হীরেন চট্টোপাধ্যায়

[**আগে যা ঘটেছে ঃ** একবিংশ শতকের শেষের দিকে বৈজ্ঞানিক ডঃ অনুতোষ বোস তৈরী করলেন এক বিস্ময়কর যন্ত্রদানব, রোব্বোস—যে মানুষের মত চিন্তা ও অনুভব করতে পারে। রোব্বোসের অনুরোধে তাঁর একসময়ের সহকর্মী অসৎ বৈজ্ঞানিক ভবরঞ্জনের ল্যাবরেটরীতে বসে রোব্বোসের বন্ধু রোব্‌কেও তৈরী করলেন ডঃ বোস। কয়েকদিন ভবরঞ্জনের কাছে ওদের থাকতে অনুমতি দিয়ে তিনি বাড়ী ফিরে গেলেন। এবার ভবরঞ্জন রোব্বোস ও রোবের মস্তিষ্কে ভাইব্রেটার লাগিয়ে নিজের আবিষ্কৃত ট্রান্সমাইণ্ড টুপি পরে ওদের ওপর প্রভুত্ব করার চেষ্টা করল। ওরা বলল, ভবরঞ্জন ঘুমোলে ওরা পালাবে। কিন্তু ভবরঞ্জন ওদের মস্তিষ্কে ভাইব্রেটর এঁটে দিয়ে দেহে বিদ্যুৎপ্রবাহ বন্ধ করার সুইচ লাগিয়ে ওদের ওপর প্রভুত্ব করার কাজ পাকা করল। এর পর সে ওদের নিয়ে গেল নিজের তৈরী অতিকায় মুণ্ডুহীন যন্ত্রমানবের কাছে।]

'সেটা আমার মনে আছে রোব্বোস—যত মূর্খ বৈজ্ঞানিক তুমি আমায় ভাবছো আমি ঠিক ততটা নই। যান্ত্রিক ক্ষমতার এটাই শেষ সীমা—স্থিতিস্থাপকতা, চলাফেরা, শক্তি—সব ব্যাপারেই তাই, আমি হিসেব করে দেখেছি। আমার সমস্যা হচ্ছে, ওটাকে আমি শুধু প্রাণ দিতে চাই না, একটি অনুভূতিশীল রোবট করতে চাই—ঠিক তোমার মতো।'

'মানে? যান্ত্রিক মস্তিষ্ক?' রোব্বোস একেবারে ঘুরে গিয়েছে ভবরঞ্জনের দিকে—'আপনি তো ভাল করেই জানেন, সেটা আমার ক্ষমতার বাইরে।'

'সেইজন্যে সে জিনিষ তৈরী করতে আমি তোমায় বলছি না—ভবরঞ্জন সিগারেটের টুকরোটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলল, 'মস্তিষ্ক এখন আমার কাছেই আছে, তুমি শুধু সেটাকে ওর দেহে ঠিক করে বসিয়ে দেবে।'

'আপনার কাছে আছে? তার মানে?'

'মানেটা তোমার মত বুদ্ধিমান রোবটকেও বুঝিয়ে বলতে হবে'—ভবরঞ্জন কঠিন মুখে রোব্বোসের দিকে তাকাল—চাবুকের মত কণ্ঠস্বর করে বলল, 'রোবের মাথাটা ওখানে বসিয়ে দাও।'

'না!' প্রায় নিজের অজান্তেই শব্দটা বেরিয়ে এল রোব্বোসের মুখ থেকে। একটা অদ্ভুত অনুভূতি ওর মস্তিষ্ককে অবশ করে ফেলছিল। ভবরঞ্জনের নির্দেশ ছাড়া মাথা ঘোরাবারও ক্ষমতা ছিল না ওর, কিন্তু যন্ত্রদেহের প্রত্যেকটি পরমাণু যেন বিদ্রোহ করছে—ও বুঝতে পারছিল।

'কোন লাভ নেই রোব্বোস, তুমি ভাল করেই জানো।'

হ্যাঁ, রোব্বোস জানে। সে প্রায় নিজেই অবাক হয়ে যাচ্ছিল, যখন দেখছিল তার হাতদুটো এগিয়ে যাচ্ছে রোবের মাথার দিকে। আগেই অবশ্য সুইচ টিপে রোব্‌কে অফ্ করে দিয়েছিল ভবরঞ্জন, রোবের

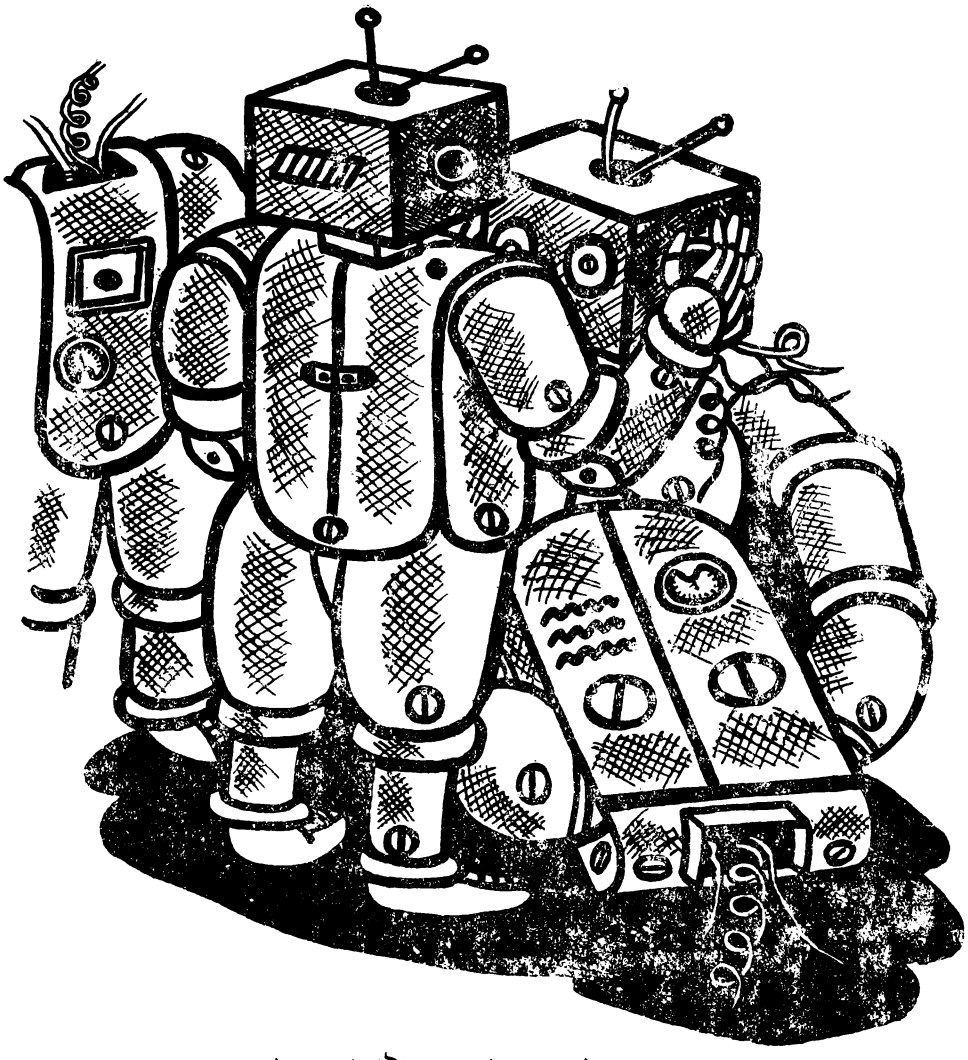

রোবের মাথাটা দেহ থেকে সে খুলে ফেলল !

এখন কোন অনুভূতি হওয়ার কথা নয়, তবু হাতের সর্বত্র কেমন যেন একটা সংকোচন অনুভব করছিল রোব্বোস। এইভাবেই এক সময় রোবের মাথাটা দেহ থেকে সে খুলে ফেলল !

রোবের এই চেহারা দেখে তার ধাতব চোখের পাতা এক মুহূর্তের জন্য নীচে নেমে এসেছিল, ভবরঞ্জনের আদেশ ভেসে এল—'দেরি করো না রোব্বোস, অনেক রাত হয়েছে।'

রোব্বোস হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল মাটিতে শোয়ানো সেই অতিকায় যন্ত্রদানবের পাশে। কাঁধের শূন্য গহ্বর থেকে যেসব তার বেরিয়ে এসেছিল সবগুলো মস্তিষ্কের সঙ্গে ঠিকঠাক জায়গায় জুড়ে দিল। তারপর মাথাটা শক্ত করে ঘাড়ের ওপর বসিয়ে ভাল করে স্ক্রু দিয়ে এঁটে দিল।

'চমৎকার।' ভবরঞ্জন খুশিতে ঝকঝক করে উঠল, গণেশের দিকে চেয়ে বলল—'কিহে, পছন্দ ?'

কুতকুতে চোখদুটো আরো একটু কুঁচকে গণেশ বলল, 'দেহের তুলনায় মাথাটা অবশ্যি একটু ইয়ে হয়ে গেল—'

'হোক না ইয়ে, ছোট হলেও মাথাটা তো আর কম কাজ করবে না—কি বল হে রোব্বোস ?'

রোব্বোস কথা না বলে যেমন রোবের দেহটার দিকে চেয়েছিল, তেমনি চেয়ে রইল।

'দুঃখু হচ্ছে !' গণেশ ভবরঞ্জনকে খোঁচা মেরে বলল—'হাজার হোক বন্ধু বলে কথা—একসঙ্গে সূর্যাস্ত দেখছিল'—

'দেখুক না যত খুশি, আটকাচ্ছে কে'—ভবরঞ্জনের নিটোল টাক ঢাকা পড়ে গিয়েছিল হেলমেটে, তার ওপরেই একবার অভ্যেসমত হাত বুলিয়ে নিয়ে বলল, 'বন্ধু তোমার ঠিকই থাকল রোব্বোস, শুধু চেহারাটা একটু বড় হয়ে গেল।'

'ওকে আমি তৈরি করেছিলাম।' রোব্বোস কেটে কেটে বলল।

'সেটা অবশ্য ঠিকই, কিন্তু দেহের আর কি দাম বল—মাথাটাই তো আসল! সেটা যখন ঠিকই থাকল তখন আর তোমার দুঃখ কিসের ? ওকে না হয় আমরা রোবই বলবো, কি বলো গণেশ ?'

'নিশ্চয়ই, ও হলো গিয়ে বড় রোব্ !' মুচকি হেসে একটু নড়েচড়ে উঠল গণেশ সামন্ত, বলল—'এবার কিন্তু আমি উঠবো।'

'উঠবে ?' ভবরঞ্জন ভুরু কুঁচকে তাকাল গণেশের দিকে—'এখনই উঠে পড়বে ?'

'উঠবো না ? বারোটা বেজে গেছে—রাত কম হলো নাকি ?'

'হোক না— রাত না হলে খেলা জমবে কেন ?'

'খেলা ? কিসের খেলা ?'

'রাবিশ! বলি খেলাই যদি একটু আধটু না হবে তবে আর এত কাণ্ড করলাম কেন ?' রোব্বোসের দিকে ফিরে ভবরঞ্জন বলল, 'ওহে, ওর সুইচটা অন করে দাও না—দেখি তুমি কাজকর্ম সব ঠিকঠাক করলে কিনা !'

রোব্বোস হাত বাড়িয়ে দানবটার পেছনের সুইচ অন করে দিল।

সঙ্গে সঙ্গে চড়াক করে একটা শব্দ হল। তারপরই বিশাল দানবটা প্রচণ্ড ধাতব শব্দ তুলে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল।

'বাপ্ স্ !' প্রায় আর্তনাদ করে উঠল গণেশ। শায়িত অবস্থায় ভাল বুঝতে পারেনি, উঠে দাঁড়াতে বুকটা ঢিপ ঢিপ করে উঠল।

'কেমন বুঝছো ?'

'বুঝছি মানে ?' গণেশ চটপট দুটো ঢোঁক হজম করে বলল—'পিলে চমকে গেছে একেবারে।'

'ওরকম নড়বড়ে পিলে রাখো কেন—সময়মতো পাল্টে নিয়ো।'

'পালটে নেব ? পিলে ? কি যে বলো না'—হাসি আর মুখে আসছিল না, তবু মুখটা হাসি হাসি করে গণেশ বলল, 'নাও নাও খেলাটেলা কি সব দেখাবে বলছিলে—শুরু করে দাও।'

'ঠিক বলেছো, বসো—ওই চেয়ারটায় বসো।' নিজেও একটা চেয়ারে বসে ভবরঞ্জন বললে—'খেলাটা তুমিও দেখো না হয় রোব্বোস, হাজার হোক, তোমার বন্ধু তো !'

'কি করবেন ওকে নিয়ে ?'

'না না, তেমন কিছু নয়'—ভবরঞ্জন কোটের পকেট থেকে দার্জিলিঙের রাস্তা-ঘাটের নক্সা আঁকা একটা ম্যাপ বার করে বলল, 'তোমার বন্ধু—মানে, রোব্কে আমরা একটু হাওয়া খেতে পাঠাবো আর কি !'

'মানে ?'

'মানে খুব সহজ—দার্জিলিং শহরটা রাতে কেমন দেখায় একটু দেখুক না ঘুরে-ফিরে! রিমোট কণ্ট্রোল হেলমেট তো আমার সঙ্গেই রয়েছে—রেডিও ওয়েভের রেঞ্জ তো আর কম নয়, কি বলো ?'

'আমি জানি, আপনি এখান থেকে ওকে নির্দেশ দেবেন। কিন্তু কি করাতে চান আপনি ওকে দিয়ে ?'

'আর যাই হোক, দুটো বুদ্ধিমান যন্ত্র বসে বসে সূর্যাস্তের শোভা দেখবে—এ নিশ্চয়ই চাই না, ওসব বাজে সেন্টিমেণ্ট আমার নেই। যন্ত্র কখনো মানুষ হয় না—তোমাদের আমরা কাজ করাবার জন্যে তৈরি করেছি, ব্যাস এতেই সন্তুষ্ট থাকো। পৃথিবীর লোককে আমি দেখিয়ে দেব, বুদ্ধিমান যন্ত্র হিসেবে অনুভূতিশীল রোবটকে কিভাবে ব্যবহার করতে হয়।'

'কি বলতে চান আপনি ?'

'সেটা চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখলেই বুঝতে পারবে। দেখবে বলেই তো তোমার সুইচ অফ করিনি।'

না, তা ভবরঞ্জন করেনি। কিন্তু এরপর যে কাণ্ডকারখানা শুরু হল, তাতে রোব্বোসের মনে হচ্ছিল তার কানেকশন কেটে দেওয়া এর চেয়ে অনেক ভাল ছিল।

রোব্ বেরিয়ে যাবার পর থেকেই ভবরঞ্জন উঁচু গলাতে নির্দেশ দিতে শুরু করেছিল। রোব্ কি দেখছে না দেখছে তাও নিশ্চয়ই ও জানাচ্ছিল, কিন্তু রোব্বোস তা শুনতে পাচ্ছিল না। যা শুনতে পাচ্ছিল তাতেই তার মস্তিষ্ক অসহায় ক্রোধে অস্থির হয়ে পড়ছিল।

সঠিক রাস্তা দিয়ে পাঠিয়ে নির্দিষ্ট লক্ষ্যের সামনে রোব্কে বোধহয় পৌঁছে দেওয়া হয়েছিল, ভবরঞ্জন বললে—'ভাল করে পড়ো—ওটা ব্যাঙ্ক তো ?'

অস্ফুট একটা শব্দ বেরিয়ে এল রোব্বোসের মুখ থেকে, বলল—'এ আপনি কি করছেন ?'

সেদিকে কান দেবার সময় ভবরঞ্জনের ছিল না, বললে, 'ঠিক আছে, কোলাপসিব্ল্ গেটটা চাপ দিয়ে ভেঙে ফেলো।'

'শুনুন।' চীৎকার করে উঠল রোব্বোস—'এরকম অন্যায় কাজ ওকে দিয়ে করাবেন না।'

ক্রুদ্ধ চোখ তুলে একবার শুধু তাকাল ভবরঞ্জন। গণেশের চোখ খুশিতে নাচছিল, কলল—'আপদটাকে ঘুম পাড়িয়ে দাও না।'

'তুমি থামো! ভাল করে বুঝে নিক না ব্যাপারটা। শোনো রোব্বোস, তোমায় আমি নির্দেশ দিচ্ছি—একটুও নড়বে না'—কথা বলতে বলতেই ভবরঞ্জনের মুখ কঠিন হয়ে যাচ্ছিল, বললে, 'কি বলছো রোব্ ? একটা মানুষ শুয়েছিল ? তোমাকে দেখে উঠে পড়েছে ? না না, ছেড়ো না, শিগ্গির হাত দিয়ে ওর গলাটা টিপে ধরো।'

'না!' যান্ত্রিক ক্ষমতার শেষ সীমায় উঠে চেঁচিয়ে উঠল রোব্বোস—'কি জঘন্য কাজ আপনি করাতে যাচ্ছেন ওকে দিয়ে—'

সেসব কথা শোনবার সময় ভবরঞ্জনের ছিল না, রোবের গলা ওর কানে পৌঁছতেই মুখ চোখ আবার স্বাভাবিক হয়ে গেল, বললে—'ভেরি গুড। এবার ভেতরে ঢোক।'

'ঢুকতে তো বলছো'—গণেশ উৎসাহে তোতলাতে শুরু করেছিল, 'কিন্তু টাকা পয়সা কোথায় আছে ও জানবে কি করে ?'

'আমি তো জানি'—ভবরঞ্জন আড়চোখে গণেশের দিকে চেয়ে বলল, 'নইলে এতো জায়গা থাকতে ওখানেই বা ওকে পাঠাবো কেন ?'

রোব্বোসের সমস্ত শরীরে কম্পন জাগছিল, বলল, 'মানুষটাকে কি রোব্ মেরে ফেলেছে ?'

গণেশ বিরক্ত দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে বলল, 'না, আদর করেছে। যত্তো সব।'

যন্ত্রণাদায়ক অনুভূতির মধ্যেই রোব্বোস শুনতে পাচ্ছিল ভবরঞ্জন বলছে—'হ্যাঁ, ওইটাই·····ভেঙে ফেলো···পেয়েছো তো?···ঠিক আছে, বাণ্ডিলগুলো ভাল করে চেপে ধরে নিয়ে এসো। সাবধান, একটাও যেন রাস্তায় পড়ে না যায়—ঠিক যে রাস্তা দিয়ে গিয়েছিলে সেই রাস্তা দিয়েই ফিরে এসো।'

গণেশ আনন্দে চিঁ চিঁ করছিল—ভবরঞ্জন এরপর রোব্বোসের দিকে ফিরে বলল, 'এবার বলো তো রোব্বোস কি বলছিলে?'

'মানুষটাকে আপনি খুন করলেন?'

'আমি? দূর পাগলা'—ভবরঞ্জন খ্যাঁক খ্যাঁক করে হেসে উঠল, 'আমি কেন করতে যাবো, করলো তো রোব্! ব্যাঙ্ক ডাকাতিও তো সেই করেছে।'

'আপনিই তো করালেন!'

'কে জানছে সে কথা!'

'যদি কেউ ওকে দেখতে পেয়ে থাকে?'

'এতো রাত্তিরে?' ভবরঞ্জন পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বার করল, বলল—'যদি পায় তাতেই বা কি, আমি তো আর অনুভূতিশীল রোবট তৈরি করিনি!'

'মানে?'

'মানে ও জিনিস কে তৈরি করেছেন সে তো সবাই জানে!'

'কি সাংঘাতিক!' রোব্বোসের কণ্ঠস্বরে কোন অনুভূতি ফোটে না, কিন্তু ওর শরীরে বিদ্যুৎতরঙ্গ খেলে গেল, বলল—'তার মানে কেউ দেখে ফেললে দোষ হবে ডক্টর বোসের?'

'সেই সঙ্গে তোমারও—কারণ এরকম বুদ্ধিমান রোবট অন্তত আমাদের দেশে তো আর নেই!'

[চলবে]

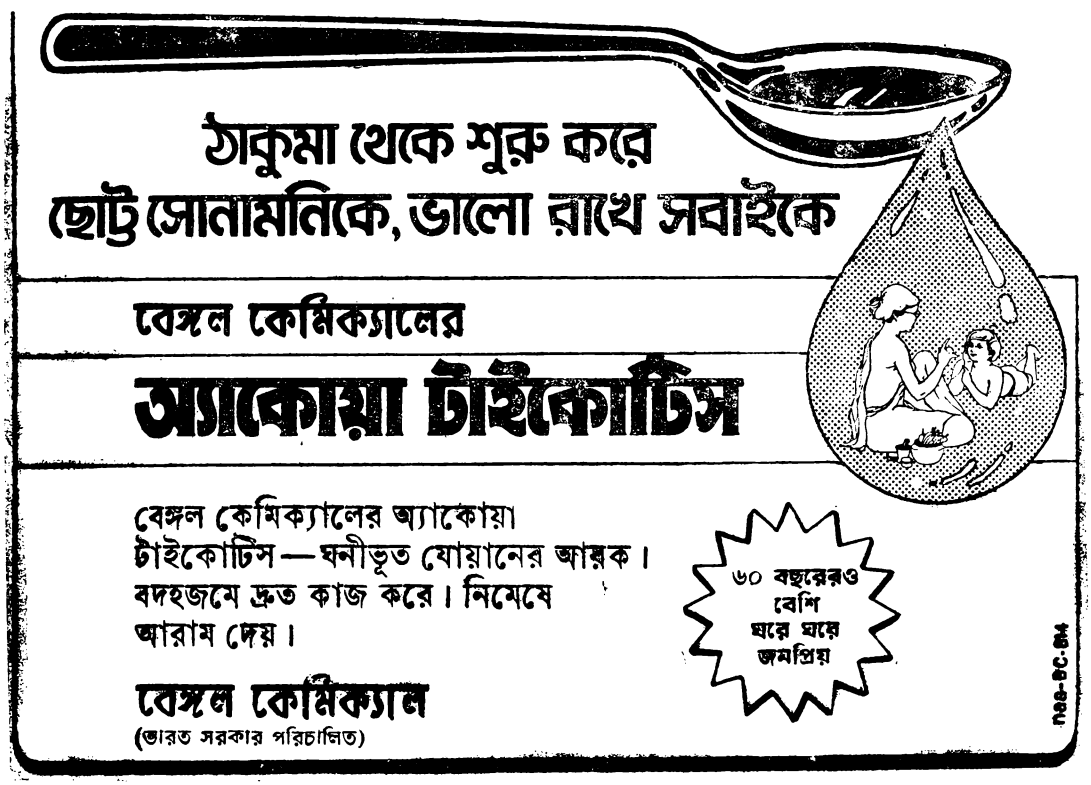

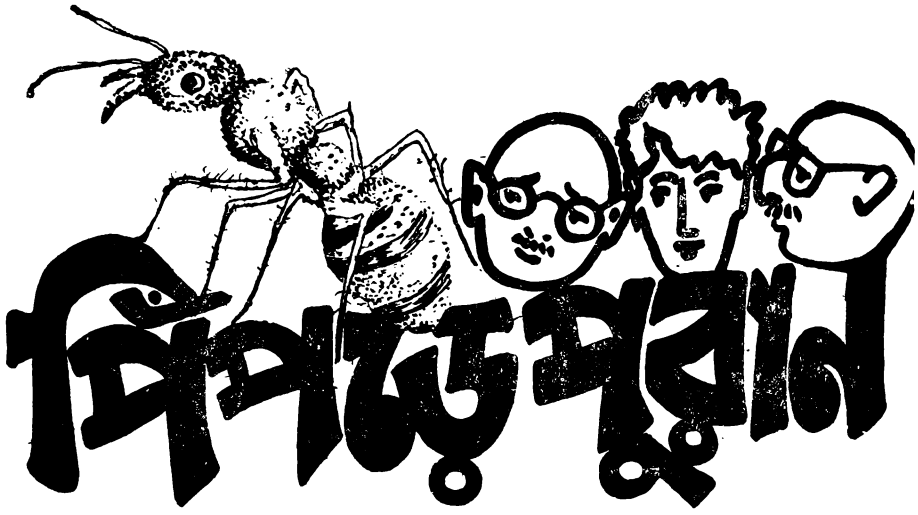

প্রেমেন্দ্র মিত্র

[৭৮৯৯ সাল পর্যন্ত দক্ষিণ আমেরিকায় মানুষের বাস ছিল—তারপরই ছ'ফুট লম্বা পিঁপড়েরা আন্দিজ পাহাড় থেকে বেড়িয়ে এসে ওখানকার মানুষদের তাড়ায়। এই পিঁপড়েদের কথা প্রথম জানতে পারেন পর্যটক অশেষ রায়।]

তখনো ঘুমের ঘোর কাটেনি, অর্ধ-জাগ্রত অবস্থায় বাইরে গিয়ে দাঁড়ালাম।

মণ্ডুলা উত্তেজিতভাবে বললেন—'চেয়ে দেখুন—নিচে চেয়ে দেখুন।'

নিচে চেয়ে দেখে সত্যিই অবাক হয়ে গেলাম। অন্ধকারে সেই পার্বত্য জলাশয়ের ধারে নানা জায়গায় অসংখ্য আলো জ্বলছে। সে আলোয় আমাদের পাহাড় থেকে বিশেষ কিছুই দেখা যাচ্ছিল না, শুধু অস্পষ্টভাবে ওই জানোয়ারদের নড়া-চড়া এক-আধটু টের পাওয়া যাচ্ছিল। আমরা কিন্তু মন্ত্রমুগ্ধের মতো সেইদিকে চেয়ে বসে রইলাম। এতবড় বিস্ময়জনক ব্যাপার বিশ্বাস করতে যেন আমাদের সাহস হচ্ছিল না।

ভোর হওয়ার কিছু আগেই সমস্ত আলো নিভে গেল। আমরা কিন্তু সেখান থেকে উঠতে পারিনি। ভোরের আলোয় ঐ জলাশয়ের দিকে চেয়ে আমাদের বিস্ময়ের আর অবধি রইল না। জলাশয়ের পশ্চিম-পাড়ে প্রায় দশবিঘা জমির জঙ্গল একেবারে সাফ হয়ে গেছে। আগের দিন সন্ধ্যেবেলা যে প্রকাণ্ড গাছগুলি সে-স্থান অন্ধকার ক'রে দাঁড়িয়েছিল, তাদের চিহ্ন পর্যন্তও নেই।

মণ্ডুলার উত্তেজনা তখনো শান্ত হয়নি। আমার হাতটা সজোরে নাড়া দিয়ে তিনি বললেন—'আমার কি মনে হয় জানেন, আমরা যে অদ্ভুত জানোয়ার দেখেছি তারা কীটজাতীয় প্রাণী!'

এবার কিন্তু আমি না হেসে পারলাম না, বললাম—'কারণ আপনি কীট-তত্ত্ববিদ্!'

মণ্ডুলা আমার পরিহাসে কান না দিয়ে বললেন—'হ্যাঁ, তাই! কীটজাতীয় ছাড়া পৃথিবীর কোনো প্রাণীর চারটার বেশি পা দেখেছেন?'

কথাটা সত্যি! আমরা যে অদ্ভুত জানোয়ার দেখেছি, তাদের পা কতগুলি, তা গুণতে না পারলেও চারের যে বেশি, এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহই নেই।

মণ্ডুলা বলে যাচ্ছিলেন—'তাছাড়া আকৃতির কথা মনে রাখবেন।'

বললাম—'কিন্তু এত বড় কীট ?'

মণ্ডুলা বলবেন—'অসম্ভব তো নয়।'

তারপর পুরো একটি সপ্তাহ আমরা সেই পাহাড়ে এই অদ্ভুত প্রাণী দেখবার জন্যে অপেক্ষা করি, কিন্তু আর কিছু দেখবার সৌভাগ্য আমাদের হয়নি।

অশেষ রায়ের বর্ণনা এইখানেই শেষ হয়েছে। তারপর এক হাজার বছর এই প্রাণীর কথা আর কিছু শোনা যায়নি। অশেষ রায় ও মণ্ডুলার কথায় পৃথিবীর লোক হাসলেও কেউ কেউ যে এ-বিষয়ে অনুসন্ধান করবার জন্যে সেখানে যায়নি, এমন নয়। কিন্তু আর কোনো পর্যটকের চোখে কিছু পড়েনি। এখন আমরা অবশ্য বুঝতে পারছি যে, অশেষ রায় এই পিঁপড়েদেরই দেখেছিলেন! তাঁর বর্ণনার একটি বর্ণও মিথ্যে নয়। কিন্তু মানুষ নিশ্চিন্ত হয়েই ছিল!

এই পিঁপড়ের কথা যখন আমরা জানলাম, তখন আর সময় নেই। ৭৭৫৭ সালে একেবারে বজ্রপাতের মতো আচম্বিতে মানুষকে এই পিঁপড়ের আক্রমণ অভিভূত ক'রে দেয়। আক্রমণের আগের মুহূর্ত পর্যন্ত কেউ এ-কথা কল্পনাও করেনি। পিঁপড়েরা যে বহুদিন থেকে গোপনে প্রস্তুত হয়েছিল, তার প্রমাণ ৭০ ডিগ্রি লঙ্গিচিউডের পশ্চিম-ধারে দক্ষিণ-আমেরিকার সমস্ত প্রধান নগর একদিনে ধ্বসে পড়ে। কতদিন আগে থেকে যে পিঁপড়েরা এই নগরগুলো ফোঁপরা ক'রে এসেছে, কেউ তা বলতে পারে না। মানুষ মাটির ওপরেই যুদ্ধ করতে ব্যস্ত। মাটির তলায় কোনো শত্রু তার সর্বনাশের আয়োজন করছে, এ-কথা সে কেমন ক'রে জানবে! ৭৭৫৭ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী রাত একটার সময় কলম্বিয়া, ভেনেজুয়েলা, পেরু, ইকোয়েডরের মতো সমস্ত বড়-বড় শহর যখন হঠাৎ ভীষণ শব্দে ধ্বসে পড়ে, তখনো কেউ সন্দেহ করেনি যে, এ কোনো শত্রুর কাজ। বিরাট ভূমিকম্প ভেবেই মানুষ তখন ভয় পেয়েছিল। কিন্তু ধ্বসে-পড়া নগরগুলির বিরাট বিশৃঙ্খলার ওপর যখন প্রভাত হলো, তখন যে-দৃশ্য প্রতি নগরের মুষ্টিমেয় জীবিত নগরবাসীদের চোখে পড়ল তা অতি ভয়ঙ্কর। প্রতি নগরের চারিধারে অসংখ্য পিপীলিকা বাহিনী ঘিরে দাঁড়িয়েছে।

পিঁপড়েদের সেই প্রথম আক্রমণে যে-সমস্ত নগর ধ্বংস হয়ে যায়, তার একটি মাত্র অধিবাসীই রক্ষা পেয়েছিলেন। তিনি রায়োবোমা নগরের ডন পেরিটো। নগর-ধ্বংসের সঙ্গে-সঙ্গেই অধিকাংশ লোক মারা পড়েছিল, যে-কয়েকজন সকালবেলা পর্যন্ত কোনোরকমে জীবিত ছিল, পিঁপড়েরা তাদের নির্মমভাবে সংহার করে। মানুষ সেবার যুদ্ধের অবসর পর্যন্ত পায়নি—প্রস্তুতই তারা ছিল না! ডন পেরিটো কোনোরকমে তাঁর এরোপ্লেন চ'ড়ে একেবারে মেক্সিকোতে পালিয়ে আসেন। এরোপ্লেনে চ'ড়েও যে তাঁর নিস্তার ছিল, তা নয়। এমনি এরোপ্লেনে ক'রে আরো অনেকে পালাতে চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু পাখাওয়ালা পিঁপড়েরা আকাশে পর্যন্ত তাঁদের অনুসরণ ক'রে তাঁদের সে চেষ্টা ব্যর্থ ক'রে দেয়। ডন পেরিটোর জীবনরক্ষা হয়েছিল শুধু তাঁর উপস্থিত বুদ্ধিতে! অন্য সকলের মতো প্রথম থেকেই এরোপ্লেনে লম্বা পাড়ি দেওয়ার চেষ্টা না ক'রে তিনি প্রথমে শুধু ঊর্ধ্বে আরোহণ করবার চেষ্টা করেন। পিঁপড়েরা আটহাজার ফিট পর্যন্ত তাঁকে তাড়া করে, কিন্তু তারা আর উঠতে পারে না বলেই তিনি রেহাই পান। পিঁপড়েদের প্রথম আক্রমণের কাহিনী পৃথিবীর লোক তাঁর কাছেই পায়।

তারপর কয়েক বছরের মধ্যে পিঁপড়েরা কি-ভাবে গায়না, ব্রেজিল, বলিভিয়া ও আর্জেনটাইন-রিপাবলিক দখল করে, তার ইতিহাস তোমরা কিছু-কিছু নিশ্চয়ই জান। (চলবে)

বিজ্ঞান-ভিত্তিক গল্প

কে আমি?

নিরঞ্জন সিংহ

সেই দুর্ঘটনার পর থেকেই আমার কি যেন হয়েছে। আজকাল কিছু নিয়ে ভাবতে শুরু করলে থামতে পারি না। মাঝে মাঝে ভীষণ অস্বস্তি বোধ করি। এরা আমাকে এমন একটা জায়গায় রেখেছে যেখানে পৃথিবীর আলো-গন্ধ-শব্দ কিচ্ছু প্রবেশ করে না। এখনো জানি না কেন এরা আমাকে এখানে বন্দী করে রেখেছে। এরা কারা? শত্রু না মিত্র তাও আমার অজানা। মাঝে মাঝে ভাবতে ভাবতে কেমন যেন ক্লান্ত হয়ে পড়ি।

কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, এ ধরণের ভাবনার মধ্যে আমি খুব একটা আনন্দ পাই না, অথচ পরিচিত জগতের কথা ভাবতে সবারই তো ভাল লাগার কথা। মাঝে মাঝে আমার নিজের পরিচয় সম্বন্ধেও কেমন যেন সন্দেহ জাগে। আমি আমার নাম মনে করতে পারি, আবার ভুলে যাই। আমার বয়েস মনে করতে চেষ্টা করি। কোন সময় মনে হয় আমার বয়েস হয়তো চব্বিশ বছর, কখনো মনে হয় চব্বিশের কম, আবার কখনো মনে হয় চব্বিশের থেকে অনেক বেশী। কেন এমন হয় আমি জানি না। তবে আমার সন্দেহ হয় এসবের জন্যে দায়ী এই অন্ধকার পরিবেশ আর আমার একাকিত্ব। কেন এরা আমাকে এমনভাবে বন্দী করে রেখেছে? কোথায় আমাকে রেখেছে? পৃথিবীর মাটিতে? নাকি গভীর সমুদ্রের তলদেশে? নাকি নিক্ষেপ করেছে মহাশূন্যের শব্দ-গন্ধ-আলোহীন জগতে। কি আমার অপরাধ, জানিনা, তবে মনে পড়ে একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দ। একটা ভয়াবহ দুর্ঘটনা। কিন্তু কখনই আমি পুরো ব্যাপারটা মনে করতে পারি না। জোর করে মনে করতে গেলে আমার চিন্তাশক্তি যেন থেমে যায়। মনে হয় আমি যেন কোন অন্ধকার সমুদ্রের অতলে তলিয়ে যাচ্ছি।

তবে কি আমি মরে গেছি? কিন্তু তাই বা কি করে হবে? মরে গেলে আমি চিন্তা করছি কি করে? ক্লান্ত হয়ে পড়ছি কি করে? মৃতেরা নিশ্চয় ক্লান্ত হয় না।

দুর্ঘটনার আগের কিছু কথা আমার মনে পড়ে। আমি আর আমার বন্ধু রুনু আমার ছোট্ট গাড়ী করে বেড়াতে বেরিয়েছিলাম। সেদিনও বোধহয় রুনু হাল্কাভাবে দু' একবার আমাকে সাবধান করেছিল। আসলে রাফ্ চালাবার জন্য দুর্ঘটনা ঘটেনি এই আমার বিশ্বাস।

সেই দুর্ঘটনায় রুনুও নিশ্চয় আহত হয়েছিল, কিন্তু আশ্চর্য, কেউ আমাকে রুনুর খবরটা জানালো না। কেউ আমার খবরও নিল না। যেন এই পৃথিবীতে আমি আত্মীয়বন্ধুহীন! কিন্তু একথা তো সত্যি নয়। কোথাও কিছু একটা ভয়ানক গণ্ডগোল হয়ে গেছে, কিন্তু সেটা যে কি তা হাজার চেষ্টা করেও বুঝে উঠতে পারছি না।

আমি কি আসলে হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে আছি? আমার মাথায় কি প্লাস্টার করা হয়েছে—যার নিচে চাপা পড়েছে আমার চোখ, মুখ, কান,

নাক? না না, তা কি করে সম্ভব? এভাবে কোন রুগীকে প্লাস্টার করে না। তবে? বারবার আমি আমার একাকিত্ব ও অনুভূতিহীন পরিবেশের মধ্যে ঘুরপাক খেয়ে মরছি। এখান থেকে আমাকে কি কেউ মুক্ত করবে না? অসহ্য এ নিঃসঙ্গতা। উঃ কী ভয়ানক শাস্তি আমাকে দিয়েছে। মানুষ কি অনুভূতিহীন হয়ে বেঁচে থাকতে পারে? হয়তো পারে—কিন্তু সে তো মৃত্যুরই নামান্তর। আমাকে এরা একেবারে মেরে ফেলছে না কেন?

সময় নিশ্চয় চলছে। কারণ মহাকাল কখনো থেমে থাকতে পারে না। তবে আমার কাছে সময় মৃত। সে স্তব্ধ। অথবা সময় এত দ্রুত ছুটে চলেছে যার সঙ্গে আমি তাল রাখতে পারছি না—সময়স্রোত থেকে আমি বিচ্ছিন্ন। পার্থিব-অপার্থিব, চেতন-অচেতন, সময়-অসময়—কোন কিছুর পার্থক্য আমার কাছে স্পষ্ট নয়! তবে আমি যে এখনো মরিনি একথা হলফ করে বলতে পারি।

আস্তে আস্তে আমার মধ্যে একটা ভয়ঙ্কর পরিবর্তন ঘটে চলেছে। জানিনা ভাল কি মন্দ, তবে পরিবর্তনটা স্পষ্ট অনুভব করতে পারছি। মনে হচ্ছে আমার মধ্যে একটা অদ্ভুত শক্তি জন্ম নিচ্ছে। আর এ হয়তো নিঃসঙ্গতারই ফল। নিঃসঙ্গ হওয়ার জন্যই আমাকে আস্তে আস্তে নিজের মধ্যে গুটিয়ে আনতে হয়েছে। আমিই আমার আত্মীয়, আমার বন্ধু, এক অদ্ভুত অবস্থা, এক আশ্চর্য অনুভূতি! আমার কিন্তু খারাপ লাগছে না, বরং ভালই লাগছে। কেমন যেন একটা স্থিতধী ভাব এসেছে আমার মধ্যে। একেই কি অলৌকিক শক্তি বলে? আমি জানিনা। তবে স্পষ্ট অনুভব করছি এই পরিবর্তন। নিঃসঙ্গতা মানুষকে বোধহয় দার্শনিক করে তোলে।

আমার শক্তি যেন দিন দিন বেড়েই চলেছে। আমি যেন আস্তে আস্তে নিজের স্বরূপ বুঝতে পারছি। বুঝতে পারছি আমি কে? কিন্তু আমি ভয় পাচ্ছি কেন? আমি কাঁপছি কেন? নিজেকে জানাই তো পরম জানা। তবে তা জেনে আমি ভয় পাচ্ছি কেন? চরম জানা কি সব সময় সুখের নয়? হয়ত তাই। হায়! এ আমি কি জানলাম? আমি মানুষ নই! আমি ব্যক্তিত্বহীন অসহায় এক প্রত্যঙ্গমাত্র! আমার কান্না পেল। কিন্তু এখন জানি হাজার কাঁদলেও আমার চোখের জল কোনদিনই পৃথিবীর মাটি স্পর্শ করবে না, কারণ আমার চোখ নেই। আমার হাহাকার ধ্বনি কোনদিন বাতাসে ছড়াবে না, কারণ আমার মুখ নেই।

এখনও জানতে চাও আমি কে? কি আমার পরিচয়? তবে শোন, আমি বীক্ষণাগারের কাচের পাত্রে জিইয়ে রাখা এক জীবন্ত মগজ!

জীবাণুসার

● অ্যাজোটোবেকটার ●

জমির উর্বরতা ও ফলন বাড়ায়, গাছ দ্রুত বাড়ে, ঝাঁকড়া হয় ও সতেজ থাকে, ফুল ও ফলের আকার বড় হয়, দানা পুষ্ট হয়, গাছের রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে, ছত্রাক-রোগ নিয়ন্ত্রিত হয়, জমির জল ধরে রাখার ক্ষমতা বাড়ে

● রাইজোবিয়াম ●

বাদাম, সয়াবীন ও সমস্ত ডালচাষে 'রাইজোবিয়াম' জীবাণুসার ব্যবহার করুন। রাইজোবিয়াম ফলন বাড়ায় এবং পরবর্ত্তী ফসলের জন্য প্রচুর পরিমাণে নাইট্রোজেন জমিতে সঞ্চিত রাখে।

প্রস্তুতকারক :-নাইট্রোফিক্স ইণ্ডাষ্ট্রিজ

(ভারত সরকার অনুমোদিত)

ব্লক ডি, জয়শ্রী পার্ক কলিকাতা-৭০০০৩৪

ফোন : ৭৭-৩৩২৬, ৭৭-১৪৯০

ওজোন-বিজ্ঞান

প্রফেসর সান্যালের বাড়িতে প্রতি শনিবার সন্ধ্যায় আমাদের যে আড্ডা বসে তাকে বিজ্ঞানের আড্ডা বলা যেতে পারে। কারণ আমাদের ঐ আড্ডায় বিজ্ঞান ছাড়া অন্য বিষয়ের প্রবেশ নাস্তি। ভুল করে কেউ' যদি বিষয়ান্তরে যায় তবে জরিমানা হিসেবে সকলকে দই মিষ্টি খাওয়াতে হয়। এরকম খাওয়া আমাদের মাঝে মধ্যেই হয়ে থাকে। এবং আমার মত আনাড়ির ওপরই কোপটা বেশী পড়ে।

এ্যাসিড-বৃষ্টি !

জীবন ভৌমিক

আমাদের গত সপ্তাহের আড্ডা কিছুতেই জমছিল না। নষ্ট দুধের মত কেটে কেটে যাচ্ছিল। তার কারণটা অবশ্য বৃষ্টি। বিকেল থেকে বৃষ্টি। তার সঙ্গে ছাতা ওল্টানো বাতাস। বাড়ি থেকে বেরুনো দায়। তবে আমি সময়মতই উপস্থিত ছিলাম এবং ঘণ্টাখানেকের মধ্যে একে একে আরও চারজন। সবার মুখেই বৃষ্টির কথা। আষাঢ়-শ্রাবণের চৌকাঠ ডিঙিয়ে বর্ষা যেভাবে আশ্বিনের বারান্দায় প্রবেশ করছে সেই প্রসঙ্গ তুলে প্যাটেল বলল যে ভূগোল নতুন করে লেখা দরকার। বাংলার ষড়-ঋতু তাদের নির্দিষ্ট সময়সীমা মানছে না। প্যাটেল গুজরাটি ছেলে। চমৎকার বাংলা বলে। পড়তেও পারে। আমাদের বিজ্ঞানের আড্ডার নতুন সদস্য। প্যাটেলের কথাতে প্রফেসার সান্যাল বললেন যে, ব্যাপারটা খুবই ভাববার কথা। অথচ আমাদের আবহাওয়াবিদরা যে বিষয়টি নিয়ে তেমন কোন গবেষণা করছেন সে খবরও পাচ্ছি না। মৌসুমী বায়ুর হালচাল, তার সাম্প্রতিক গতিবিধি নিয়ে গবেষণামুলক ভাল কাজ হলে আমরা জানতে পারতাম যে কী কারণে মৌসুমী ভিন্‌পথে চলে যাচ্ছে। মৌসুমীকে ধরা যাচ্ছে না কেন !

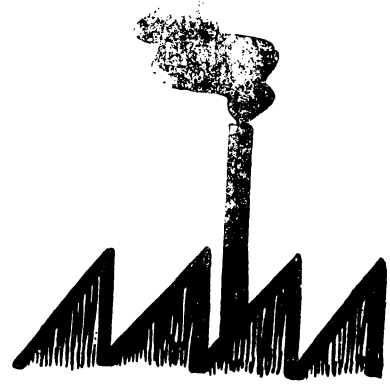

'ধরতে হবে না। আমি এসে গেছি !' আমরা সকলে একসঙ্গে দরজার দিকে তাকিয়ে দেখি আমাদের মৌসুমী মিত্র তার শাড়ির জল নিংড়োচ্ছে। আমি বললাম—তোমার কথা হচ্ছে না, ম্যাডাম। আমরা মৌসুমী বায়ুর কথা বলছি।

মৌসুমী বলল—'আজকের কাগজে একটা খবর দেখেছেন ? সাংঘাতিক খবর !'

এতক্ষণে বোধহয় আড্ডা নতুন মোড় নিচ্ছে,

আমরা সবাই উৎসুক। বললাম 'কি সাংঘাতিক খবর ?'

মৌসুমী বলল, 'দাঁড়ান, আগে গা-হাত-পা থেকে বৃষ্টির জল ভাল করে মুছে নিই। বৃষ্টির জলের সঙ্গে অ্যাসিড পড়ছে—আপনারা পড়েননি কাগজে ?'

আমি বললাম—'হ্যাঁ, সে তো পড়েছি। ছোট করে খবর বেরিয়েছে। বৈজ্ঞানিকরা জানিয়েছেন যে বৃষ্টির জলের সঙ্গে এ্যাসিড পাওয়া গেছে। কিন্তু তুমি এমন করছ যেন এ্যাসিডে তোমার গা-হাত-পা পুড়ে যাচ্ছে। আমাদের এখানকার বৃষ্টির জলে তো এ্যাসিডের সন্ধান এখনও পাওয়া যায়নি—'

'পেতে কতক্ষণ !' মৌসুমী যেন আর্তনাদ করে উঠল !

অভিজিৎ খুব কম কথা বলে। মৌসুমীর নার্ভাসনেস্ দেখে সে বলল—'আসলে কাগজের খবরটা এত সংক্ষিপ্ত যে প্রত্যেকেই ভুল বুঝে আতঙ্কিত হতে পারে। তবে আমার মনে হয় বৃষ্টির জলে এ্যাসিডের সন্ধান বাইরের কোন দেশে পাওয়া গেছে। আমাদের কোনও ভয় নেই।'

প্রফেসর সান্যাল তার আলমারি থেকে বিদেশী একটা ম্যাগাজিন বের করে কী যেন খুঁজছিলেন। একসময় চশমা খুলে সান্যালদা মৌসুমীকে জিজ্ঞেস করলেন,—'যিনি এই খবরটা জানিয়েছেন সেই বৈজ্ঞানিকের নাম মনে আছে ?'

মৌসুমী বলল—'সিওর ! বৈজ্ঞানিকটি হচ্ছেন যুক্তরাষ্ট্রের পরিবেশ বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক লিওন ডসিঙ্গার।

আমি বললাম—'কাগজের ছোট খবরটি আমার মুখস্থ। বলব ?'

সঞ্জয় বলল—'না, এটা পড়া মুখস্থ বলবার জায়গা নয়। যদি কিছু বুঝে থাক তো সেটা বল।'

আমি বললাম—'দেখ, আমি যা বুঝেছি তা হ'ল এই যে—পৃথিবী থেকে যে সব পদার্থ এবং গ্যাস উপরের বাতাসে উঠে যায় তা অবশ্যই নানাবিধ মাধ্যমের সাহায্যে পৃথিবীর মাটিতে আবার ফিরে আসে। এখানকার কলকারখানার ধোঁয়া, গাড়ির ধোঁয়া—এসব থেকে বের হয়ে আসা সালফার ও নাইট্রিক অক্সাইড বাতাসে মিশে যাচ্ছে এবং উপরের বাতাসে বৃষ্টির জলের সঙ্গে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় এ্যাসিডে পরিবর্তিত হয়ে বৃষ্টির সঙ্গে পৃথিবীর জলে স্থলে নেমে আসছে।'

আমার কথা শেষ হলে দেখলাম সকলেই আমার দিকে তাকিয়ে আছে। অর্থাৎ কেউ ভাবতেই পারেনি যে আমি এতসব খবর রাখি। প্যাটেল উঠে গিয়ে সান্যালদার হাতের ম্যাগাজিনটা দেখতে দেখতে জিজ্ঞেস করল, 'এর মধ্যে কিছু আছে নাকি ?'

সান্যালদা বললেন—'তেমন কিছু নেই, তবে আমি যেটুকু জানি তোমাদের বলতে পারি।'

সঞ্জয় বলল—'তার আগে আমি যা জানি সেটা বলে নিই। আসলে ওয়াশিংটনে বিশ্ব-পরিবেশ বিষয়ক এক অধিবেশন বসে। এই অধিবেশনেই ভয়ানক সংবাদটি জানানো হয়। সমস্ত বিজ্ঞানীরা স্বীকার করেছেন যে পৃথিবীর জলে-স্থলে বৃষ্টির জলের সঙ্গে এই এ্যাসিড বর্ষণ বর্তমান শতাব্দীর সবচেয়ে বিপজ্জনক সমস্যা।'

আমি আর মৌসুমী প্রায় একসঙ্গে বলে উঠলাম—'এত আমিও জানি।'

সঞ্জয় একবার মৌসুমীর দিকে এবং একবার আমার দিকে ভুরু কুঁচকে তাকাল। বলল—'তোমরা আর কী জানতে ?'

আমি বললাম—'একফোঁটা বৃষ্টির জল পরীক্ষা করে বৈজ্ঞানিকরা জানিয়েছেন যে তাতে বিশুদ্ধ জল

ছাড়া বাকী পদার্থের তিন ভাগের এক ভাগ নাইট্রিক এ্যাসিড এবং দুভাগ সালফিউরিক এ্যাসিড।'

অভিজিৎ বলল—'বৃষ্টির জলের সঙ্গে সালফিউরিক এ্যাসিড কোন্ দেশে পড়ছে সেটা কিন্তু তোমরা কেউ বললে না।'

মৌসুমী বললে—'তাইত! এটা না জানতে পারলে নিশ্চিন্ত হওয়া যাচ্ছে না।'

সান্যালদা বললেন—'এখনও পর্যন্ত নরওয়ে, কানাডা ও সুইডেনে এই ধরনের বৃষ্টিপাত হচ্ছে। সেখানকার জলাশয়ে মাছের অস্তিত্ব ক্রমশঃ লোপ পাচ্ছে। নিউইয়র্কের যে হ্রদগুলোতে বেশী মাছ পাওয়া যেত সেই এডিরোনডাক অঞ্চল এই এ্যাসিড বৃষ্টির ফলে এখন প্রায় মৎস্যহীন!'

প্যাটেল বলল—'মৌসুমীদি, তোমার মাছ খাওয়া এবার বন্ধ হবে।'

মৌসুমী হেসে বললে—'সে তো এমনিতেই বন্ধ হতে চলেছে ভাই।'

আমি বললাম—'প্যাটেল, তোমরা কি আজ জরিমানা দিতে চাইছ? মাছের প্রসঙ্গ উঠলেই যে মাছ খাওয়ার কথা উঠবে তার কোন মানে নেই।'

সান্যালদা বললেন—'যাকগে, আজ ওয়ার্নিং দিয়ে ছেড়ে দাও। যা বলছিলাম, এ্যাসিড বৃষ্টির ফলে ইউরোপের কয়েকটি অঞ্চলের বনভূমিতে গাছপালার জন্ম ও বৃদ্ধি ১৯৫০ সাল থেকে ক্রমেই হ্রাস পাচ্ছে।'

সঞ্জয় জিজ্ঞেস করল—'তা হলে এই মারাত্মক বিপদের হাত থেকে কি ভারতবর্ষ মুক্ত?'

সান্যালদা জানালেন যে এ্যাসিড বৃষ্টি থেকে কোন দেশকেই ঠিক মুক্ত বলা যায় না। কারণ একটি অঞ্চলের দূষিত গ্যাস বা ধোঁয়া বাতাসের সঙ্গে যখন মিশে যায় তখন সেই বাতাস যে ঠিক সেই অঞ্চলেই ভেসে বেড়াবে তার কোনও স্থিরতা নেই। কারণ বাতাস তো কোন দেশের সীমানা মানে না।

নিবারণ চাটুজ্যে এতক্ষণ মুখ খোলেননি। সব শুনে-টুনে বললেন—'তাহলে তুমি বলতে চাইছ যে মণ্টানা শহরের বাতাসে মেশা সালফার ও নাইট্রিক এ্যাসিড ওহিও শহরের বৃষ্টির সঙ্গে নামতে পারে! সুইডেনের এ্যাসিড বৃষ্টির উৎস পশ্চিম জার্মানি হতে পারে?'

সান্যালদা বললেন—'একশবার পারে। ভয়টা তো সেখানেই। আর তাছাড়া, ভারতবর্ষের বিভিন্ন শহরের বাতাস যেভাবে দূষিত হচ্ছে তাতে এখানেও বৃষ্টির জলের সঙ্গে সালফিউরিক এ্যাসিড পড়তে খুব বেশী দেরী নেই।'

মৌসুমী বললে—'সেটাই তো আমি বলছি। তাছাড়া ইউরোপীয় কোনও দেশের দূষিত বাতাস এশিয়ার দেশকে বিপন্ন করে তুলতে কতক্ষণ!'

আমি মৌসুমীকে ধন্যবাদ জানালাম। কারণ ওর জন্যেই সেদিনকার বিজ্ঞানের আড্ডা শেষ পর্যন্ত জমে উঠেছিল। বৃষ্টির জলে এ্যাসিডের কথাটা মৌসুমীই তুলেছিল।

Survey & Drawing Syndicate

Survey, Mathematical & Drawing Instruments, Scientific Stationers.

2A, Lakshmi Dutta Lane,
Calcutta-700003 (Bagbazar)

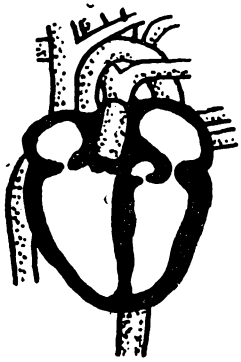

রক্তচাপের রেগুলেটর !

"সব ব্যাপারেই এখন জোচ্চুরীর রাজত্ব চলছে।"

যুগপৎ গাবলু-টুম্পার বাবার গলার আওয়াজ এবং টেলিফোন ডায়ালিং-এর শব্দ শুনে পাশের ঘর থেকে এ ঘরে চলে এলো ছোটমামা।

—"কি ব্যাপার? জোচ্চুরীর খবর জানাবার জন্য টেলিফোন করছেন কাকে? লালবাজার না আনন্দবাজার?"

চোখেমুখে বিরক্তির ছাপ ফুটিয়ে সত্যবাবু বললেন—"তাই করা উচিত। তবে টেলিফোনও হয়েছে সেরকমই, স্রেফ ঘর সাজানোর খেলনা। কাজের সময় যদি একটা লাইন পাওয়া যায়! ফোন করছিলাম বিষ্টুকে, ছেলেটাকে ভাল বলেই জানতাম, এখন দেখছি বিজনেসম্যানদের জোচ্চুরীর ব্যাপার স্যাপারগুলো ও ভালই শিখে ফেলেছে।"

ছোটমামা বললো, "বিষ্টু···নামটা যেন চেনা চেনা লাগছে?"

—"আরে খবরের কাগজে হামেশাই বিজ্ঞাপন দেয় না—'সমুদ্র-সৈকতে' কোম্পানীর পাখা, সাত বছরের গ্যারান্টি! ঐ 'সমুদ্র সৈকতে' হচ্ছে বিষ্টুর কোম্পানী। ফ্যান যে খারাপ তৈরী করছে তাও না। অনেকদিন থেকেই জানা-শোনা। একটা অফিসে কিছু ফ্যান কেনার দরকার ছিল, আমি বিষ্টুর কোম্পানীর নাম রেকমেণ্ড করলাম। চল্লিশটা পাখা দিয়েছে অথচ সবকটার রেগুলেটর খারাপ। মাঝখান থেকে আমার পজিশন'টা কি দাঁড়াচ্ছে বল দেখি? বিষ্টুর জোচ্চুরীটা হচ্ছে যে—ও ফ্যানের জন্য সাত বছরে গ্যারান্টি দিয়েছে, কিন্তু গ্যারান্টির আওতা থেকে 'রেগুলেটর' বাদ।

ছোটমামা হাসল। "আপনি ঠিকই বলেছেন। রেগুলেটরটাই আসল। ভাল রেগুলেটর না হলে আসল যন্ত্রটার কোন দামই থাকে না।"

পাশ থেকে টুম্পা বললো—"যেমন ধরো আমাদের রক্ত চাপের রেগুলেটর, তাই না ছোটমামা? তুমি তো এ নিয়ে আমাদের বলবে বলেছিলে?"

সত্যবাবু বললেন—"আমার সে রেগুলেটরটাও খুব ভাল কিনা—মাঝে মাঝে সন্দেহ জাগে। বিষ্টুর ব্যাপারটা শোনার পর থেকে আমার 'প্রেশার' বেড়ে গ্যাছে। মনে হচ্ছে যেন ব্লাড প্রেশারের রেগুলেটরটা গড়বড় করছে তুমি একবার 'প্রেশার'টা দেখে দিও তো।"

টুম্পা বললো—"এখন মাপলে তোমার প্রেশার বেশী থাকবেই, যে রকম রেগে আছো!"

ছোটমামা বললো—"টুম্পা কথাটা ভুল বলে নি। রীগ কম যাদের, তাদের ব্লাড প্রেশারও কথায় কথায় উপরের দিকে ওঠে না। পুরাণের গল্পে দেখুন না, মুনি ঋষিরা সকলকে উপদেশ দিতেন—'জীতেন্দ্রিয় হও', অথচ অধিকাংশ বাবা-ঠাকুরদের 'ক্রোধ' রিপুটির ওপর বিন্দুমাত্র কণ্ট্রোল ছিল না। আসলে সে যুগে সব হাই-প্রেশারের রোগী ছিল—আর হবেও না বা কেন, সারাজীবন তপস্যা আর খাওয়া বলতে স্রেফ দুধ আর ঘি—প্রেশারের আর দোষ কি? আর তারা সব মরতেন 'সন্ন্যাস' রোগে।"

গাবলু বললো—"তুমি কি করে জানলে কিভাবে তারা মারা যেত?"

—"আরে বাবা, সন্ন্যাসীরা যে রোগে মরে তার নামই 'সন্ন্যাস' রোগ অর্থাৎ এখনকার দিনের 'হার্ট অ্যাটাক' আর কি! অবশ্য আজকালকার দিনে সন্ন্যাসীদের আর 'সন্ন্যাস' রোগ হয় না, দুধ ঘি বরাতে জুটছে কই? উলটে গৃহীরাই এখন 'সন্ন্যাস' রোগে মরছে, বিশেষতঃ যারা 'গদী'তে বসে 'বেওসা' করছে আর মনের সুখে দুধ-ঘি, রসগোল্লা, সন্দেশ, পোলাও-কালিয়া···"

সত্যবাবু বললেন—"ব্যাস্, ব্যাস। আর না। যে সব জিনিষগুলো আমি খেতে ভালবাসি অথচ এরা কিছুতেই আমাকে খেতে দেবে না, সেইসব জিনিষের নাম করা চলবে না। কিন্তু এই তেল-ঘি, পোলাও-কালিয়ার ওপর তোমরা, মানে ডাক্তাররা খড়্গহস্ত কেন বল দিখি?"

টুম্পা বললো—"খুব সোজা। তেল-ঘি খেলে রক্তে কোলেস্টেরল বাড়বে, সেগুলো গিয়ে রক্তনালীর গায়ে জমে সেগুলোকে শক্ত করে দেবে, ঘটবে নানা বিপত্তি।"

ছোটমামা চেয়ার থেকে উঠে ফ্যানের রেগুলেটরটা এক পয়েন্ট বাড়িয়ে দিয়ে এলো।

—"যদি কোন কারণে শরীরের কোন অংশে রক্ত চলাচলের মাত্রাটা বেড়ে যায়, যেমন ধর বিষ্টুবাবুর ব্যাপারে তোর বাবার মুখ আর মাথার দিকে বেশী রক্ত যখন যাচ্ছিল, তখন অজান্তেই দুটো ব্যাপার কিন্তু ঘটে যাচ্ছিল—হার্ট বেশীবার, বেশী জোরে পাম্প করছিল যাতে বেশী রক্ত সেইদিকে যেতে পারে আর শরীরের বাকি অংশে রক্ত চলাচল গিয়েছিল কমে, যাতে রক্তটা সেইদিকে না গিয়ে মাথার দিকে ছোটে! কিন্তু এই ব্যাপারটা বেশীক্ষণ চলার আগেই 'রেগুলেটর' কাজ করতে আরম্ভ করলো। ফলে প্রেশার খানিকটা উঠতে না উঠতেই, থেমে গেল। মাঝখানে কিছু সময় গল্পগুজব হলো, প্রেশার মাপলে দেখবি একদম 'নর্মাল'! কিন্তু এটা যদি বেশী তেল-ঘি খাওয়া লোকের ক্ষেত্রে হতো, তাহলে প্রেশার নেমে আসতে আরও অনেকক্ষণ সময় লেগে যেত।

সত্যবাবু এতক্ষণ চোখ বুজে কথাবার্তা শুনছিলেন। চোখ না খুলেই বললেন—"তাহলে বোঝা যাচ্ছে বেশী 'ফ্যাট' দিয়ে মেসিনপত্র নষ্ট করে রাখলে ভাল 'রেগুলেটর'ও কাজ করবে না। তা, তা এই রেগুলেটরটি কোথায় বসান আছে?"

ছোটমামা বললো—"রেগুলেটর তো একটা নয়, একাধিক। প্রেশার ঠিক রাখার জন্য রক্তনালীর দেওয়ালে কোন কোন জায়গায় বিশেষ কতকগুলো ব্যবস্থা আছে। এগুলোই রক্তচাপের রেগুলেটর বা 'ব্যারোরিসেপ্টার'!

টুম্পা বললো—"এগুলি সব রক্তনালীর দেওয়ালেই আছে?"

ছোটমামা বললো—"আসলে যেগুলো বেশী দরকারী রেগুলেটর তারা থাকে হার্ট থেকে যে মহাধমনী বেরিয়ে আসছে, তার ভেতরের দেওয়ালে আর যে রাস্তা দিয়ে রক্ত মাথায় যায়, সেই 'ক্যারোটিড' ধমনীতে! রক্তচাপ বেড়ে গেলে সেই ধাক্কা গিয়ে পড়বে 'ব্যারোরিসেপ্টার'—ওমনি শুরু হয়ে যাবে 'টরেটক্কা'!

সত্যবাবু বললেন—"টরেটক্কা, মানে?"

ছোটমামা হেসে ফেললো। "টরেটক্কা মানে টেলিগ্রাফিক ব্যবস্থা। রেগুলেটর থেকে নার্ভ দিয়ে খবর চলে গেল 'ব্রেনে'র বিশেষ কিছু অংশে—'রক্তচাপ বাড়ছে'। হেড অফিস তার উত্তরে অন্য কতকগুলো নার্ভ দিয়ে হার্ট আর রক্তনালীগুলোকে খবর পাঠাল—'অবস্থা সামলাও'। হার্ট তার চলার গতি কমাবে, রক্তনালীগুলো তার দেওয়ালের মাসল্গুলোকে ঢিলে দেবে ফলে রক্তও রক্তনালীর দেওয়ালে কম ধাক্কা দিতে দিতে যাবে, মোটমাট সব মিলে রক্তচাপ কমবে। তবে হ্যাঁ—এই রেগুলেটরও একটা 'রেঞ্জে'র মধ্যে কাজটা ভালভাবে করে। কুকুর জাতীয় প্রাণীর ওপর পরীক্ষায় দেখা গ্যাছে এই রেঞ্জটা হচ্ছে ৬০ থেকে ১৫০ মিলিমিটার পারদ চাপের মতো।"

টুম্পা বললো—"কিন্তু ধরো, প্রেশার যদি হঠাৎ কমে যায়, তখন কি হবে?"

—"এখানেও কাজটা একই ধরণের হবে, তবে উল্টোভাবে। সঙ্গে কয়েকটা হরমোনও কাজ করতে শুরু করবে। যেমন ধর, ভয় পেলে, বিশেষ কয়েকটা নার্ভের মাধ্যমে 'কিডনী'র মাথায় লাগানো 'অ্যাডরেনাল গ্ল্যাণ্ড' বিশেষ কিছু হরমোন রক্তে মেশাবে যারা হার্টের ধুকপুকুনি বাড়িয়ে দেবে। তাছাড়াও যদি কোনভাবে রক্তে অক্সিজেনের পরিমাণ কমে, কার্বন ডাই-অক্সাইডের মাত্রা বেড়ে যায়, তাহলে ঐ 'স্বয়ংক্রিয় টরেটক্কা' চালু হয়ে নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের গতি বেড়ে যাবে। এটা তো জানিস, রক্তচাপের সঙ্গে নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের একেবারে গলা জড়াজড়ি সম্পর্ক আছে?"

টুম্পা বললো—"সেটা আবার কি ব্যাপার?"

ছোটমামা গম্ভীর মুখে বললো—"ব্যাপারটা খুব গোলমেলে আর জটিল। জট ছাড়াতে গেলে এককাপ গরম চা' প্রয়োজন।"

●সুভাষ সান্যাল

বিশ্বজুড়ে বিচিত্র প্রাণ

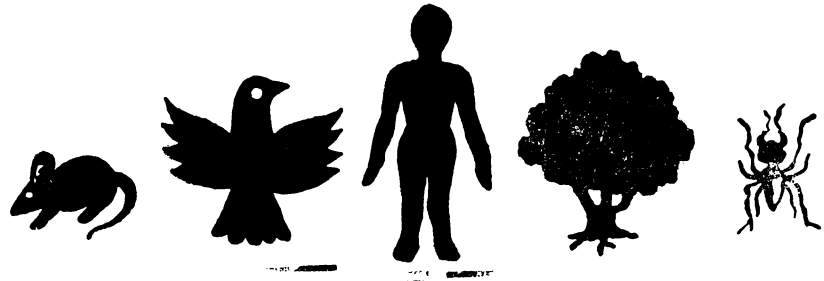

কৃষ্ণা ঘোষাল

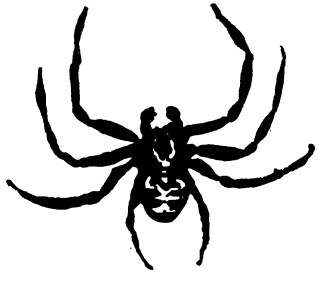

শিকার ধরতে—জলে নেমেছে মাকড়সা। এ দৃশ্য অবশ্য আমাদের দেশের পুকুর-পাড়ে বসলে হামেশাই চোখে পড়ে। তবে মাকড়সা মাছেরই মত জলে জীবন কাটাচ্ছে—এমন কথা শুনেছ কি? সত্যি এরকম মজাদার মাকড়সাও আছে! যারা জলে ডুব দিয়ে কিছুক্ষণ সেখানে কাটিয়ে আসে অথচ এতটুকু গা ভেজে না। তবে এদেরই একটা জাত

আছে যারা জলেই জীবনটা কাটিয়ে দেয়। এদেরও অবশ্য গা ভেজার বালাই নেই। এরা সকলেই লালা দিয়ে সিল্কের জামা বুনে গায়ে পরে থাকে। যারা সাময়িকভাবে জলে ডোবে তারা এই জামার ফাঁকে একটু অক্সিজেন ভর্তি করে নেয়। নইলে দম বন্ধ হয়ে যাবে যে! আর মাছের মতো এদের দেহে তো জলের অক্সিজেনকে শুষে নেওয়ার ব্যবস্থা নেই। তবে যারা জলের পাকাপাকি বাসিন্দা তারা জলের অক্সিজেনকেই কাজে লাগায়। এদের দেহ থেকে অনর্গল বুদবুদ বেরোয়। সে ভারী মজা লাগে দেখতে। পৃথিবীর গরম দেশগুলোতেই জলজ মাকড়সাদের দেখা মেলে। মাকড়সাদের জলে নামার কারণ অবশ্য ডাঙার পোকামাকড়ে রুচির অভাব এদের চাই জলের পোকা আর ছোটখাট মাছ।

মাকড়সাদের মতো কাঁকড়া-বিছেরও একটা জাত জলে নেমেছে। এদের দম নেওয়ার ব্যাপারটা ভারী মজার। মুখটা কাঁকড়া বিছের মতোই, তবে দম নেওয়ার ব্যবস্থা সেখানে নেই। এদের লেজের দিকে আছে ওপরমুখী নল। সাবমেরিনের মতো কাদা কাদা জলে নল উঁচিয়ে চলে এরা। এই নলটাই এদের দম নেওয়ার পথ। এরা তাই মাকড়সাদের মতো নিশ্চিন্তে জলের ভেতর ডুব দিতে পারে না।

প্রাণী জগতের অনেকেই লাফালাফি করতে বেশ ওস্তাদ। তবে হরদমই লাফ দিচ্ছে—মানে লাফ দিয়ে চলাফেরা করে যারা—তাদের লাফ দেওয়ার ধরণটাই মজার। লেজ আর পেছনের পা দুটোর ওপর ভরসা করেই এদের

লাফ দেওয়া। কারণ সামনের দুটো পাই এদের ছোট।

কাঙারুরা এক লাফে যে কতটা যেতে পারে তা হিসেব করলে দেখা যাবে বাঘা বাঘা লম্ফবাজেরাও এদের কাছে নেহাৎ শিশু। ভাবতে পারো—একটা মাঝারি মাপের কাঙারু ২৬ ফুট এক লাফে চলে যেতে পারে!

শুধু লাফালাফিই নয় কাঙারুদের অনেক কিছুই বেশ মজার। কাঙারুরা স্তন্যপায়ী অথচ এদের স্ত্রীজাতির পেটে আছে থলি। অন্য কোনও স্তন্যপায়ীর দেহে কিন্তু এ ব্যবস্থা নেই। বিজ্ঞানীরা বলেন—কাঙারুরা সরীসৃপ আর স্তন্যপায়ীর মাঝামাঝি একটা স্তরের প্রাণী। এরা ডিম পাড়ে না। মা কাঙারু একটি বাচ্চাই প্রসব করে। তবে সেই বাচ্চা জন্মের সময় অপরিণত অবস্থায় থাকে। আর মাপেও অস্বাভাবিক রকমের ছোট। একটা বড় বড় কাঙারুর মাত্র ১ ইঞ্চি লম্বা বাচ্চা হতেও দেখা গেছে! এই বাচ্চাকে বাঁচাতে গেলে চাই ভাল রক্ষণাবেক্ষণ। তাই মা-কাঙারুর পেটে থলির ব্যবস্থা। এই থলির ভেতরেই মায়ের দুধ আসে। আর তাই বাচ্চা-কাঙারুকে খাবারের খোঁজে আর বাইরে বেড়াতে হয় না। থলির নিরাপদ আশ্রয়েই কাটে কাঙারুর শৈশব।

আমরা কাঙারুকে আজ অষ্ট্রেলিয়ার প্রাণী বলে সবাই জানি। অথচ আজ থেকে বেশ কয়েক লক্ষ বছর আগে সারা পৃথিবী জুড়েই এদের বাস ছিল। বিবর্তনের পথ বেয়ে যখন স্তন্যপায়ীরা এলো, এরা কোণঠাসা হোলো অষ্ট্রেলিয়ায় আর আমেরিকার স্থল ভাগের দিকে। তখন অবশ্য পৃথিবীর সব মহাদেশগুলোই মিলে মিশে ছিল। তারপর সবাই বিচ্ছিন্ন হোলো। অষ্ট্রেলিয়া মুলুকে অন্য স্তন্যপায়ীরা দলে দলে পৌঁছতে পারেনি। তাই সেখানে আজও কাঙারুরা দলে ভারী। তবে আমেরিকায় যেসব জাতের কাঙারুরা গিয়েছিল তাদের অনেকেই অন্য স্তন্যপায়ীদের সঙ্গে লড়াই-এ হেরে গেল। সেখানে আজ তাই টিকে আছে মাত্র দু চার জাতের কাঙারু।

কাঙারুদের বকমারি সাইজ, আর নানা জাত। নব্বই

গেছো কাঙারু

কিলোগ্রাম থেকে আধ কিলোগ্রাম সব সাইজেরই কাঙারু আছে। তবে এদের মধ্যে অনেকেই আছে যাদের দেখে কাঙারু বলে চেনাই মুস্কিল।

গেছো কাঙারুরা মাটি ছেড়ে সেই কবে গাছে চড়েছে তার হিসেব করাই মুস্কিল। এরা তাই অন্য জাতভাইদের মত লাফাতেই ভুলে গেছে। অস্ট্রেলিয়ার বনে জঙ্গলে, আমেরিকার মৌসুমী বনে এদের কখনও সখনও দেখা মেলে। এরা নাকি

জল খায় না। গাছের পাতায় যেটুকু জল থাকে তাতেই এদের কাজ চলে যায়।

'ইঁদুর-কাঙারু'রা লেজ আর দু'পায়ের ভরসায় লাফ দিয়ে চললেও, হঠাৎ দেখলে এদের কাঙারু বলে চেনাই মুস্কিল। আকারে এরা বড়ই ছোট। আধ কিলো থেকে তিনকিলো ওজন। লেজটা ইয়া লম্বা। যেন বড় সাইজের ইঁদুর। অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকা দুটো মহাদেশেই মরু এলাকায় এদের দেখা মেলে। এরাও আলাদা করে জল খাওয়ার অভ্যাসটা প্রায় ছেড়েই দিয়েছে।

শুধু মরুভূমিই নয়, ক্যাঙারুরা থাকে পাঁচ হাজার ফুট উঁচু এলাকাতেও। তবে ছুঁচো-মুখো এই কাঙারুদের দেখে কার সাধ্যি কাঙারু বলে চেনে?

কাঙারুদের কেউ কেউ ঘরও বাঁধে। ঘাস পাতায় গড়া —চমৎকার সে ঘর!

ঠোঁটকে পাখীরা অনেকেই শিকার ধরার কাজে লাগায়। নিউজিল্যাণ্ডের পাহাড়ী জঙ্গলের 'হুইয়া'রাও তাদের ঠোঁটকে ভরসা করেই খাবার খুঁজতে বেরোতো। ঘন জঙ্গলের গাছের ডাল, গুঁড়ি পচে—তার ভেতর যে রস তৈরী হয় সেই রসই ছিলো এদের পছন্দসই খাবার। পুরুষ পাখী তার ধারালো ঠোঁট দিয়ে ঠুকরিয়ে সে কাঠ ফুটো করতো। স্ত্রী-হুইয়া তার ছুঁচোলো লম্বা ঠোঁটের সাহায্যে গাছের ভেতরের রস টেনে নিতো। তারপর সেই রস তারা ভাগ করে খেতো দুজনে। কালো কুচ্‌কুচে হুইয়াদের লেজের পালকের খুব কদর ছিল। ১৯১০ সালে নাকি হুইয়াদের শেষ দেখা গেছে। তারপর থেকে গত ৭১ বছর হুইয়া দম্পতির বাঁশীর মতো মিষ্টি গান আর কেউ শোনে নি!

জানো কি'র উত্তর

১) গ ২) ক ৩) গ ৪) ক ৫) খ

৬) ক ৭) ক ৮) ক ৯) খ ১০) খ

জানো কি?

১) সুক্রোজ বা চিনির উপাদান কি কি?

ক) গ্যালাকটোস-ফ্রাকটোস খ) গ্লুকোজ-গ্যালাকটোস গ) গ্লুকোজ-ফ্রাকটোস।

২) ফোটোগ্রাফির কাজে 'হাইপো' না হলেই চলে না। 'হাইপো'র রাসায়নিক নাম কি?

ক) সোডিয়াম থায়োসালফেট খ) পটাশিয়াম ব্রোমাইড গ) ফসফরাস পেণ্টাক্লোরাইড।

৩) পাতার 'ষ্টোমাটা' বা পত্ররন্ধ্র খোলা-বন্ধের সঙ্গে কোন ধাতুর সম্পর্ক আছে?

ক) ক্যালসিয়াম খ) সোডিয়াম গ) পটাসিয়াম।

৪) কোন সরীসৃপের হার্টে চারটে কুঠুরী আছে?

ক) কুমীর খ) গিরগিটি গ) ড্রাকো।

৫) কোন স্তন্যপায়ীর রক্তে লোহিতকণারা নিউ-ক্লিয়াসযুক্ত?

ক) হরিণ খ) উট গ) বানর।

৬) কোন জন্তুর ডিম সব থেকে বড়ো?

ক) অস্ট্রিচ্ খ) শকুন গ) কুমীর।

৭) কোন ভিটামিনের অভাবে 'জেরপথ্যালমিয়া' রোগটি হয়?

ক) ভিটামিন-এ খ) ভিটামিন-ই গ) ভিটা-মিন-কে।

৮) 'তেজস্ক্রিয়তা'র আবিষ্কারক কে?

ক) বেকারেল খ) ব্রাগ গ) রয়েণ্টজেন্।

৯) বিখ্যাত কোন বিজ্ঞানী একাধারে পদার্থবিদ্ ও চিকিৎসাবিজ্ঞানী ছিলেন?

ক) র‍াদারফোর্ড খ) হেলমহোল্টজ্ গ) পিয়ের কুরি।

১০) 'ক্যালকুলাস'—গণিত কে আবিষ্কার করেন?

ক) ইউক্লিড খ) নিউটন গ) ডি' অ্যালেমবার্ট।

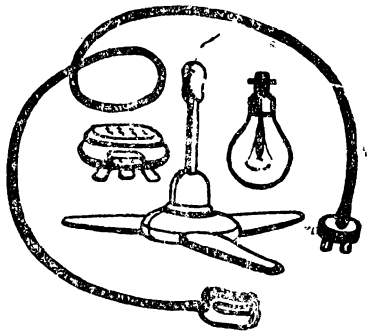

ইলেকট্রিসিটির গোড়ার কথা

সুজয় বসু

সা'রা পৃথিবী জুড়েই যে বিদ্যুত বা ইলেকট্রিসিটির ব্যবহার বাড়ছে এটা তো আজ সকলেরই জানা। আসলে একটা দেশ কত উন্নত তার মাপকাঠি হল সেই দেশের জনপ্রতি বিদ্যুৎ খরচ। নানা কাজ করা যায় বিদ্যুৎ শক্তি দিয়ে—পকেট রেডিওটা বিদ্যুতে চলছে আবার চলছে দানবের মত রেলগাড়ী। বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হলে আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার কি হাল হয় সে কথা বলবার দরকার নেই নিশ্চয়ই।

শক্তির বিভিন্ন রূপ—তাপশক্তি, যান্ত্রিক শক্তি, বিদ্যুৎ শক্তি ইত্যাদি। শক্তির রূপান্তর হয় কিন্তু বিনাশ হয় না। যান্ত্রিক ও অন্যান্য শক্তির রূপান্তর ঘটিয়ে বিদ্যুৎশক্তি পাওয়া যায়—আবার বিদ্যুৎশক্তিকে যান্ত্রিক শক্তি, তাপশক্তি ইত্যাদিতে সহজেই রূপান্তরিত করা যায়। একটা তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্রে প্রথমে কয়লা পুড়িয়ে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় তাপশক্তি এবং এই তাপশক্তির সাহায্যে জলকে বাষ্প করে সেই বাষ্প দিয়ে টারবাইন ঘুরিয়ে যান্ত্রিক শক্তি উৎপাদন করা হয়। টারবাইনের সঙ্গেই লাগানো থাকে জেনারেটর বা বিদ্যুৎ উৎপাদক যন্ত্র যা যান্ত্রিক শক্তিকে বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তর করে। এখন মজাটা হোল, প্রতিস্তরেই কিন্তু খানিকটা করে শক্তিক্ষয় হচ্ছে অর্থাৎ যন্ত্রের একপ্রান্তে যতটা শক্তি দিচ্ছি অপর প্রান্তে অন্যরূপে ততটা পাচ্ছি না। ফলে যে পরিমাণ তাপশক্তি খরচ হচ্ছে তার তিনভাগের একভাগমাত্র আমরা ব্যবহারযোগ্য বিদ্যুৎশক্তি হিসাবে পাচ্ছি বাকী দুভাগই নষ্ট হচ্ছে। এতটা শক্তি নষ্ট হচ্ছে জেনেও কেন আমরা তাপশক্তিকে বিদ্যুৎশক্তিতে রূপান্তরিত করছি? কারণ বিদ্যুৎশক্তি অন্যান্য শক্তির তুলনায় একটু উঁচুদরের। একে সহজেই বহুদূরে পাঠানো যায় পরিবাহী তারের ভিতর দিয়ে। রাশিয়ায় বড় বড় জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলো সাইবেরিয়া অঞ্চলে। সেখান থেকে কয়েক হাজার কিলোমিটার দূরের শহরগুলোতে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হচ্ছে। তাপ শক্তি বা যান্ত্রিক শক্তিকে এভাবে সরাসরি একজায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। বিদ্যুৎশক্তি বিতরণের ব্যাপারটাও খুবই সহজ—কম বেশী যে কোন পরিমাণেই সরবরাহ করা যায়। বিদ্যুৎশক্তি সঞ্চয় করে রাখাটা কিন্তু খুব কঠিন এবং তার খরচও প্রচুর। তাসত্ত্বেও প্রধানতঃ সরবরাহের সুবিধার জন্যই বিদ্যুৎশক্তির ব্যবহার দিন দিন বেড়ে চলেছে। যে সব যন্ত্রপাতি আজ মানুষের জীবনযাত্রার মোড় ঘুরিয়ে দিচ্ছে যেমন আধুনিক কম্পিউটার, সে সবই কাজ করছে বিদ্যুৎশক্তির সাহায্যে।

অথচ বিদ্যুৎ ব্যবহারের শুরু গত শতাব্দীতেই। জলবিদ্যুৎ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ভাল করে আরম্ভ হল ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে। ইতালির পিসা শহরের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক আলেসান্দ্রো ভোল্টা প্রথম তার তড়িৎ কোষের কথা সাধারণকে জানালেন এই সালে। আলাদা আলাদা দুটো ধাতুর চাকতির মাঝে পাতলা গন্ধকাম্ল অর্থাৎ সালফিউরিক অ্যাসিডে ভেজানো কাপড় রাখলেই তৈরী হয় একটা তড়িৎ কোষ যা ক্রমাগত বিদ্যুৎ প্রবাহ সৃষ্টি করতে পারে। এর আগে দীর্ঘস্থায়ী বিদ্যুৎ সরবরাহের কোন কায়দা জানা না থাকায় এই পরীক্ষা নিরীক্ষাই হতে পারেনি যদিও স্থিরবিদ্যুৎ সম্পর্কে জ্ঞান ছিল অনেকেরই। রাণী এলিজাবেথের রাজকীয় চিকিৎসা সভার সভাপতি এই বিষয়ে একটা প্রবন্ধ লিখেছিলেন বহু আগে ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে। তিনি দেখিয়েছিলেন—চুম্বক পাথরের আকর্ষণী শক্তি ও স্থির বিদ্যুতের আকর্ষণী শক্তির প্রকৃতি আলাদা। এই পৃথিবীটা যে একটা বিরাট চুম্বক সেকথাও প্রথম তিনিই বলেছিলেন। একটা কাঁচের দণ্ডকে রেশমী কাপড় দিয়ে ঘষলে অথবা হলদেটে পাথুরে রজন(amber)কে কম্বলের টুকরো দিয়ে ঘষলেও স্থিরবিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। তখন

কাঁচ বা ঐ বিশেষ রজনদণ্ডটা খুব হালকা অপরিবাহীকে কাছে টেনে আনতে পারে। অপরপক্ষে চুম্বকপাথর আকর্ষণ করে শুধুমাত্র লোহাজাতীয় জিনিসকেই। ব্যাপারটা খুবই সাধারণ কিন্তু তখন এর গুরুত্ব ছিল অনেক। চুম্বকত্ব এবং বিদ্যুৎ-এর সম্পর্ক অতি নিবিড়। এই সম্পর্কের কথা প্রথম বলেন চিকিৎসক গিলবার্ট।

কিন্তু দুশো বছর ধরে তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু জানা গেল না। আসলে তখন বিদ্যুৎ সম্পর্কে আগ্রহ ছিল কম। কারণ স্থির বিদ্যুৎ ত স্থির—একটা হ্রদ বা জলাধারের মত। আকর্ষণী শক্তি আছে কিন্তু তেমন বৈচিত্র্য নেই। হ্রদের জল যদি নদীর সৃষ্টি করে তবে সেই নদীর বুকে বয়ে যাওয়া জলধারার কত বিচিত্র রূপ, কত বিভিন্ন প্রকৃতি, কত ব্যবহার। সুতরাং বিদ্যুৎ সংক্রান্ত অগণিত যন্ত্রপাতি এবং বিভিন্ন ব্যবহারের প্রাথমিক অনুসন্ধান পর্ব শুরু হল আলেসান্দ্রো ভোল্টার তড়িৎ আবিষ্কারের পঞ্চাশ বছরের মধ্যেই। ব্যবহারিক দিক থেকে বিদ্যুৎশক্তি যে অসাধ্য সাধন করবে এ বিষয়ে অনেকেরই আর সন্দেহ রইল না।

●

পড়ুয়ার দপ্তর

এ সংখ্যায় 'পড়ুয়ার দপ্তরে'র লেখক—রহড়া রামকৃষ্ণ মিশন বয়েজ স্কুলের দশম শ্রেণীর প্রথম স্থানাধিকারী ছাত্র অরুণ মিশ্র।

অ্যাসিড কাহাকে বলে? একটি উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয়া দাও।

অ্যাসিড :—যে সকল প্রতিস্থাপনীয় হাইড্রোজেন পরমাণুযুক্ত যৌগ জলীয় দ্রবণে আয়নিত হইয়া ক্যাটায়ন (cation) রূপে কেবলমাত্র হাইড্রোজেন আয়ন এবং অ্যানায়ন (anion) রূপে হাইড্রক্সিল আয়ন ব্যাতীত অপর যে কোন অ্যানায়ন উৎপন্ন করে, এবং যে সকল হাইড্রোজেন যুক্ত যৌগের হাইড্রোজেন পরমাণু ধাতু বা ধাতুসদৃশ যৌগমূলক দ্বারা আংশিক বা পূর্ণরূপে প্রতিস্থাপিত হইয়া লবণ উৎপন্ন করে সেই সকল হাইড্রোজেন-যুক্ত যৌগকে এ্যাসিড বলে।

যেমন—হাইড্রোক্লোরিক এ্যাসিড (HCl)। ইহা জলীয়-দ্রবণে আয়নিত হইয়া ক্যাটায়নরূপে কেবলমাত্র হাইড্রোজেন (H) ও অ্যানায়নরূপে ক্লোরিন আয়ন (Cl) উৎপন্ন করে

$$HCl = H^+ + Cl^-$$

জিঙ্ক ধাতুর (Zn) দ্বারা ইহার হাইড্রোজেন পরমাণু পূর্ণরূপে প্রতিস্থাপিত হইয়া জিঙ্কক্লোরাইড লবণ ও হাইড্রোজেন উৎপন্ন হয়,

$$Zn + 2HC = ZnCl_2 + H_2$$

উদাহরণসহ সংজ্ঞা দাও (২ টি করিয়া উদাহরণ দিতে হইবে।)

হাইড্রাসিড, অক্সিএ্যাসিড, ক্ষারক, ক্ষার, লবণ।

হাইড্রাসিড :—যে সকল অ্যাসিডে অক্সিজেন থাকেনা এবং যাহা হাইড্রোজেন ও অপর একটি অধাতব মৌল বা মূলক সমন্বয়ে গঠিত তাহাকে হাইড্রাসিড (Hydracid) বলে।

যেমন— (i) হাইড্রোক্লোরিক এ্যাসিড (HCl)
(ii) হাইড্রোআয়োডিক এ্যাসিড (HI)

অক্সিএ্যাসিড :—যে সকল এ্যাসিড অক্সিজেন, হাইড্রোজেন এবং কোন অধাতব মৌল বা মূলক সমন্বয়ে গঠিত তাহাদিগকে অক্সিএ্যাসিড বলে।

যেমন— (i) সালফিউরিক এ্যাসিড (H_2SO_4)
(ii) নাইট্রিকএ্যাসিড (HNO_3)

ক্ষারক :—যে ধাতব অক্সাইড অথবা হাইড্রক্সাইড অ্যাসিডের সহিত বিক্রিয়া করিয়া লবণ এবং জল উৎপন্ন করে তাহাকে ক্ষারক (Base) বলে।

যেমন—(i) জিঙ্কঅক্সাইড (ZnO);
(ii) অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড (Al_2O_3)

ক্ষার :—জলে দ্রবণীয় ক্ষারকীয় হাইড্রক্সাইড কে ক্ষার বলে। আয়নবাদ অনুসারে যে যৌগ জলীয় দ্রবণে আয়নিত হইয়া অ্যানায়ন রূপে কেবল মাত্র হাইড্রক্সিল

আয়ন (OH) এবং ক্যাটায়ন রূপে হাইড্রোজেন আয়ন (H^+) ব্যতীত অপর যে কোনও ক্যাটায়ন উৎপন্ন করে সেই প্রকার যৌগকে ক্ষার বলে।

যেমন (i) সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড (NaOH) এবং

(ii) ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড [$Ca(OH)_2$]

লবণ :—অ্যাসিডের হাইড্রোজেন পরমাণু ধাতু বা ধাতুসদৃশ যৌগমূলক দ্বারা পূর্ণ বা আংশিকরূপে প্রতিস্থাপিত হইয়া যে যৌগ উৎপন্ন করে তাহাকে লবণ বলে।

যেমন :—(i) সোডিয়াম ক্লোরাইড (NaCl)

(ii) সোডিয়াম সালফেট (Na_2SO_4)

অম্লের ক্ষারগ্রাহীতা ও ক্ষারের অম্লগ্রাহীতা কাকে বলে ?

কোন অম্লের ক্ষারগ্রহীতা বলিতে উহার ক্ষারক প্রশমনের ক্ষমতা বুঝায় ঐ। অম্লের একটি অণুতে যতগুলি প্রতিস্থাপন—যোগ্য হাইড্রোজেন পরমাণু থাকে তাহার দ্বারাই ঐ অ্যাসিডের ক্ষারগ্রাহীতা পরিমাপ করা হয়।

ক্ষারের অম্লগ্রাহীতা বলিতে উহার অম্ল প্রশমনের ক্ষমতাকে বুঝায়,। কোন ক্ষারের একটি অণুতে যতগুলি প্রতিস্থাপনীয় হাইড্রক্সিল মূলক থাকে তাহার দ্বারা ঐ ক্ষারের অম্লগ্রাহীতা পরিমাপ করা হয়।

যুক্তসহ সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও।

সকল ক্ষারই ক্ষারক কিন্তু সকল ক্ষারক ক্ষার নহে,—কেন ?

ক্ষারকীয় হাইড্রক্সাইড জলে দ্রবণীয় হইলে তাহাকে ক্ষার বলে। যেমন—সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড। এই ক্ষারক জলে দ্রবীভূত হয় বলিয়াই ইহা ক্ষারও বটে। কিন্তু অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রক্সাইড ক্ষারকীয় হাইড্রক্সাইড হইলেও জলে দ্রবীভূত হয়না, তাই ইহা ক্ষার নহে। সুতরাং সকল ক্ষারই ক্ষারক কিন্তু সকল ক্ষারক ক্ষার নহে।

HCl-এর জলীয় দ্রবণে হাইড্রোজেন আয়ন সৃষ্টি হওয়ায় দ্রবণ আম্লিক ধর্ম লাভ করে ও নীল লিটমাসকে লাল করে। কিন্তু শুষ্ক হাইড্রোজেন ক্লোরাইডে হাইড্রোজেন আয়ন থাকে না বলিয়া উহা নীল লিটমাসের বর্ণ পরিবর্তনে অক্ষম।

"ঝিলমিল নিয়ে দুটো কথা"

সাফারি পার্কের নাম শেষ-পর্যন্ত ঝিলমিল হল।

কলকাতার দম আটকানো ভিড় আর ঘিঞ্জি পরিবেশে যাঁরা বাস করছেন তাঁদের কাছে একটু খোলা হাওয়া আর মুক্ত প্রকৃতির স্বাদ এনে দেওয়াই এই ঝিলমিলের আসল উদ্দেশ্য। ১৯৭৬-এ প্রথম হাতে নাতে কাজ করার কথা ভাবা গেল। কারণ তার আগে পর্যন্ত ঝিলমিলের জন্য কোন বরাদ্দ জোটেনি।

সল্টলেকে, পাঁচ নম্বর সেক্টরের সুখা ধূসর এলাকায় প্রায় ৪০ একর জমি জুড়ে এই ঝিলমিল উদ্যান। এখানে আরও অনেক কিছুর সঙ্গে রয়েছে 'টয়ট্রেন'। ১.৩ কি:মি: লম্বা এই ট্রেন যাত্রায় প্রত্যেক ক্ষেপে ১০০টি করে বাচ্চা চাপতে পারবে। আর থাকছে সবুজ গালিচা-ঢাকা দুটো মিনি পাহাড়। টয়ট্রেনের পরই 'সর্পোদ্যানটাই' বোধহয় এই পার্কের অন্যতম আকর্ষণ। আর আছে মস্ত বড় নির্মীয়মান পাখির খাঁচা।

পার্কটা তৈরী করতে আনুমানিক খরচ পড়বে ৩৫ লক্ষ টাকা। ইতিমধ্যে ৩০ লক্ষ টাকার মত খরচ হয়ে গেছে। কিছু বাকি কাজ এখনও চলছে। ঝিলমিলে প্রবেশ করতে হলে প্রথমেই জনপ্রতি পঞ্চাশ পয়সার টিকিট লাগবে। টয়ট্রেনের জন্য লাগবে আরও পঞ্চাশ পয়সা। সর্পোদ্যানে প্রবেশ করতে হলে কাটতে হবে তিরিশ পয়সা দামের টিকিট। সকাল সাড়ে দশটা থেকে ৫টা পর্যন্ত টিকিট বিক্রী হবে। সোম-শুক্র বন্ধ।

(জনসংযোগ বিভাগ, সি, এম, ডি, এ, ৩-এ, অকল্যাণ্ড প্রেস, কলকাতা-১৭ থেকে প্রচারিত)

ভয় এড়ানোর উপায়

—জানেন, আজ স্কুলে দারুণ এক কাণ্ড হয়েছে ! সরমাদিকে ঘরে ঢুকতে দেখে অন্তু বলে উঠল।

—কি কাণ্ড, শুনি। সরমাদি টেবিলের উপর ছাতা আর লেডিস্ ব্যাগটা রেখে বললেন।

—আজ তো আমাদের জ্যামিতির ক্লাস-টেষ্ট ছিল। আমার পাশেই বসে ব্লেড দিয়ে পেন্সিল কাটছিল প্রবীর। একটু পরেই দেখি, আঙুল কেটে ওর রক্ত পড়ছে। আমাদের অঙ্কের স্যার পাশ দিয়েই যাচ্ছিলেন, ওই ব্যাপার দেখে একটা ছেলেকে অফিস ঘরে পাঠালেন তুলো আর আয়োডিন আনতে। ঠিক তখনই ওই কাণ্ডটা ঘটল।

অন্তু যেভাবে চোখ বড় বড় করে ঘটনাটা বলছিল তা দেখে সরমাদি হেসে ফেললেন। অন্তু বলল—বললে বিশ্বাস করবেন না, আমাদের সামনের বেঞ্চের একটা ছেলে—নতুন ভর্তি হয়েছে আমাদের স্কুলে, ওই রক্ত দেখেই ক্লাসের মধ্যেই কেমন যেন চেঁচিয়ে উঠল ! আমরা সবাই ছেলেটার দিকে তাকিয়ে দেখি—ভয়ে ওর চোখ মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। তারপর হঠাৎ মাটিতে পড়ে অজ্ঞান হয়ে গেল ছেলেটা।

—ছেলেটা রক্ত দেখেই অজ্ঞান হয়ে গেল ?

—হ্যাঁ সরমাদি। রক্ত দেখে প্রচণ্ড ভয় পাওয়ার জন্যই ও অজ্ঞান হয়ে যায়। জ্ঞান ফিরে আসার পরও দু'বার ও "রক্ত" "রক্ত" বলে চেঁচিয়ে উঠেছিল।

অন্তু থামল। সরমাদি মন দিয়ে অন্তুর কথা শুনছিলেন।

—আচ্ছা সরমাদি, আপনি সেদিন বলেছিলেন, বিপদের আশঙ্কা থেকে ভয়ের জন্ম হয় আমাদের মনে। অথচ আজ হাত কেটেছিল, রক্ত পড়েছিল প্রবীরের—তবে ওই ছেলেটা অমন ভয় পেল কেন ?

—কি জান অন্তু, ভয়ে যখন ছেলেটা অজ্ঞান হয়ে গেল তখন বুঝতে হবে ওর ভয়টাও ছিল অস্বাভাবিক। এ ভয়ের পেছনে কারণ যাই থাক, আপাতদৃষ্টিতে ভয়টাকে নেহাতই অযৌক্তিক বলে মনে হবে। এই ধরনের ভয়কে বলা যেতে পারে 'ফোবিয়া'।

—জানেন, আমার এক পিসী আছে—ঘরের মধ্যে আরশোলা দেখলেই লাফঝাঁপ, চীৎকার চ্যাঁচামেচি শুরু করে দেয় ! অন্তু একনাগাড়ে কথাগুলো বলে গেল।

—হ্যাঁ, এটাও এক ধরনের ফোবিয়া। আরশোলা দেখে অস্বস্তি বা একটু-আধটু ভয় কার না হয়—অন্ততঃ মেয়েদের তো হয়ই। এ ভয়টা স্বাভাবিক। কিন্তু ঐ একই জিনিষ দেখে যদি কেউ আতঙ্কে শিরশির করে কাঁপতে থাকে, বুঝতে হবে—এ ভয়টা অস্বাভাবিক। একরকম মনের অসুখই বলা যেতে পারে একে। শুধু আরশোলা বা রক্তই নয়, অন্য বহু জিনিষেই ফোবিয়া হতে পারে। যেমন, কেউ একা একা ঘরে থাকতে ভয় পায় ; কেউ একেবারেই অন্ধকারে থাকতে পারে না ; কুকুর, বিড়ালে কারও কারও আতঙ্ক থাকে ; কেউ বা সব সময় মনে করে এই বুঝি তার শরীরে কোন রোগ-জীবাণু ঢুকল। লক্ষ্য করে দেখবে, অনেকেরই হাত ধোওয়ার বাতিক আছে। এর কারণও ওই জীবাণু সংক্রমণের আতঙ্ক।

—কেন সরমাদি, কেন লোকের মনে এমন সব অদ্ভুত আতঙ্কের সৃষ্টি হয় ? অন্তু জিজ্ঞাসা না করে পারল না।

—আমি তো আগেই বলেছি, এই আতঙ্ক বা ফোবিয়া আসলে এক ধরনের অসুখ। সরমাদি শুরু করলেন। সব অসুখেরই যেমন কারণ থাকে, যে কোন ধরনের ফোবিয়ারও তেমনি কোন না কোন কারণ থাকে। তোমার যে বন্ধু আজ রক্ত দেখে অজ্ঞান হয়ে গেল—তার কথাই ধর। এমন হতে

পারে, ওর জীবনে হয়তো বার কয়েক ভয়াবহ রক্তপাতের ঘটনা ঘটেছে। অথবা এমনও হতে পারে, ওর ছোটবেলায় হয়তো ওর কোন একান্ত আপনজনের মৃত্যুর সঙ্গে রক্তপাতের কোন ঘটনার সাক্ষী ও। এর ফলেই হয়তো কোন এক সময় রক্ত বা রক্তপাত নিয়ে ভয়াবহ আতঙ্ক ওর মাথায় ঢুকেছে।

সরমাদি থামলেন। অন্তু অনেকক্ষণ ধরেই উসখুস্ করছিল এবার বলে ফেলল—এ অসুখ থেকে সেরে ওঠার রাস্তা নেই?

—কেন থাকবেনা! সরমাদি উত্তর দিলেন।—যদি রোগীর ভয় পাওয়ার মূল কারণটা কোনভাবে জানতে পারা যায়, রোগীকে যদি তা বুঝিয়ে দেওয়া যায় তবে অনেক সময়ই রোগী ভাল হয়ে ওঠে। তবে রোগীর জীবনে কখন, কোথায় কি জাতীয় ঘটনা বা দুর্ঘটনা আতঙ্কের মূল কারণ, বেশীর ভাগ সময়ে তা খুঁজে বার করাই মুশকিল। তাছাড়া কোন কোন ক্ষেত্রে, যেমন ধরো—এ্যারোপ্লেনের পাইলট কোন প্লেন-অ্যাক্সিডেন্টে পড়লে ভয়ে পরে আর প্লেন চালায় না। মোটর গাড়ীর ড্রাইভার কিংবা ভয়াবহ কোন যুদ্ধে অংশ নিয়েছে এমন সৈন্যদের ক্ষেত্রেও এই একই জিনিষ দেখা যায়। এদের আতঙ্কের কারণটা পরিষ্কার—কিন্তু দেখা গেছে, এদের অনেক বোঝালেও কোন লাভ হয় না।

—তাহলে?

—হ্যাঁ, এদেরও অবশ্য ভয় তাড়ানোর ব্যবস্থা মনো-বিজ্ঞানীরা করেছেন।

ওঁরা দেখেছেন বিপদের আশঙ্কা আছে এমন কোন ঘটনা বার কয় ঘটিয়ে মানুষের মনে ভয় বা আতঙ্ক চিরস্থায়ী করে দেওয়া যায়। ইংরাজীতে একেই বলে কন্‌ডিশনিং।

অন্তু ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছিল না, বলল—কিন্তু ভয়টা কি করে কাটবে সরমাদি?

—বলছি। সরমাদি আবার শুরু করলেন।—অভ্যাসের বশে যে ভয়টা মনের মধ্যে গড়ে উঠে, নতুন একটা অভ্যাসের মধ্য দিয়ে ধাপে ধাপে সেই ভয়টা কাটিয়ে ওঠা যায়। উদাহরণ দিয়ে বলছি:—ধর যে ছেলেটা অ্যালশেসিয়ান কুকুর দেখে আতঙ্কে শিউরে ওঠে তাকে যদি প্রথমে একটা ইঁদুর, তার পর একটা খরগোশ বা বিড়াল, তার পর একটা কুকুরের ছবি বার কয়েক দেখানোর পর যদি একটা ছোট কুকুর যেমন ফক্সটেরিয়ারের কাছে নিয়ে যাওয়া হয় তবে দেখা যাবে সে কুকুর দেখে একটু নার্ভাস হয়ে পড়লেও আগের মত আর ভয়ে শিউরে উঠছে না। এরপর ধাপে ধাপে ছোট থেকে মাঝারি, মাঝারি থেকে বড়সড় কুকুরের এমনকি অ্যালশেসিয়ানের কাছে নিয়ে গেলে তার ভয়টা ক্রমশঃ কেটে যাবে।

অন্তু বলল—ভারী মজা তো! আচ্ছা আমাদের পাড়ার মন্টুদাকে আমি যে এত ভয় পাই, সেই ভয়টাও তো এভাবে কাটানো যায়।

—যায়-ই তো। সরমাদি হাসলেন।—তোমার তো মন্টুদাকে দেখলেই ভয় করে, রাস্তায় ওকে দেখলেই এড়িয়ে যেতে চাও। এটা না করে তুমি প্রথমে মন্টুদার দলের কোন ছেলে যাকে তোমার খারাপ লাগে না, তার সঙ্গে আলাদা করে কথা বল, ভাব জমাও। তারপর যখন সে মন্টুদার সঙ্গে সঙ্গে থাকবে, তখনও মন্টুদার সামনে তাকে ডেকে কথা বল। তাছাড়া মন্টুদা বা ওর দলের সবার দিকেই সবসময় সোজাসুজি তাকাবে। একদিন হয়তো তোমার ওই বন্ধুকে দেখতে পেলে না মন্টুদার দলে। তুমি তখন সোজাসুজি মন্টুদার কাছেই ছেলেটার খোঁজখবর কর। দেখবে এইভাবেই আস্তে আস্তে তোমার ভয়টা একেবারে কেটে যাচ্ছে। তোমাকে একটা সত্যি ঘটনা বলি। বাবা মা'র কড়া শাসনে মানুষ হয়েছিল একটা ছেলে। যখন সে বড় হল দেখা গেল, কারোর সঙ্গে কিছুতেই সে মিশতে পারে না: অফিসের অন্যান্য সহকর্মী এবং ওপরওয়ালাদের সে দারুণ ভয় পেত। একজন মনোবিজ্ঞানী একদিন তাকে বললেন—তুমি এখন থেকে রোজ অফিসে গিয়ে যাকে দেখবে তার দিকে তাকিয়ে হাতজোড় করে নমস্কার করবে। ছেলেটা যেই তা করা শুরু করল, দেখা গেল তার মনের ভেতরকার অহেতুক ভয়টাও আস্তে আস্তে কেটে যাচ্ছে; সে লোকের সঙ্গে অনায়াসে মিশতে পারছে।

সরমাদি এক নাগাড়ে বলে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ ঘড়ির দিকে খেয়াল পড়তেই বলে উঠলেন—ইস্ আজ অনেকক্ষণ গল্প করেছি, যাও—অঙ্ক বইটা চটপট্ নিয়ে এস তো এবার।

অন্তু বই আনতে চেয়ার ছেড়ে উঠল।

● অমিত চক্রবর্তী

'অধ্যক্ষা সাধনা সরকার স্মৃতি ছড়া প্রতিযোগিতা'র ফলাফল

১ম পুরস্কার : কৌশিক রায় (১৬ বছর)

একটুর জন্য !

প্যালা আর নন্দী আঁটে বসে ফন্দী
স্পুটনিকে দুজনায় চড়বে।
ছাতে বসে কাজ হবে চুপেচাপে সটকাবে
নাহলেই বড়োরা তো ধরবে !
ঘটাঘট খটাখট স্পুটনিক উদ্‌ভট
প্যালারাম বানিয়েছে কল,
নীচে তার হাউয়ের দল !

তিন-দুই-এক-জিরো দেশলাই জ্বালে হীরো—
ফটাফট ফাটে সব ক'টা !
'নন্দীরে তুই থাম'— দেয় লাফ প্যালারাম
ছ্যাঁকা লেগে জ্বলে সারা গা-টা !
চিৎপাত নন্দী বলে প্যালা—'সন্ধি',
ভুল হলো আরে ছি ছি ধ্যুৎ।
'এসকেপ ভেলোসিটি' ভুলে সব হলো মাটি
গোড়াতেই রয়ে গ্যাছে খুঁৎ !

দ্বিতীয় পুরস্কার : সুপর্ণা মুখোপাধ্যায় (১৫ বছর)

প্রিজম

দাঁড়ালাম জানলায়, ওঠে যেই সূয্যি
আলো শুধু সাদা রঙ ! একি আশ্চয্যি ?
বিনুরে শুধাই ডেকে, "সাত রঙ কোথা রে ?"
বলে বিনু—"বিজ্ঞানে তোর বটে মাথা রে !"
সূর্যের সাত রঙ দেখবি স্বচক্ষে ?
আয় তবে চটপট বিজ্ঞান-কক্ষে।
ফুটো করা বোর্ড এক টেবিলেতে পাতি,
পিছনে তাহার বিনু জ্বালে মোমবাতি।
কাঁচের প্রিজম রাখে সামনে তাহার
সাদা-রঙা পর্দায়—রঙের বাহার !
সাদা আলো ভেঙে যায় প্রিজমের মাঝে
বে-নী-আ-স-হ-ক-লা-সাতরঙে সাজে।
হেসে বিনু কয় মোরে জানিস কি এর নাম ?
নামখানি শুনে রাখ—বর্ণালী, হাঁদারাম।

তৃতীয় পুরস্কার : নুরুল আলম (১৫ বছর)

কয়লার জন্ম

খোকন এসে চুপটি করে দাঁড়ায় বাবার কাছে
'সূর্য নাকি কয়লা মাঝে মুখ লুকিয়ে আছে ?
কোলে টেনে খোকনেরে বাবা শুধান হেসে
'কয়লা-বুড়ীর জন্মকথা জানতে এলে শেষে ?

গাছপালা সব বানায় খাবার সূর্য-আলোর থেকে
লক্ষ কোটি বছরে তা মাটি দিল ঢেকে।
মাটির তলায় গাছপালা সব চাপে এবং তাপে,
ধীরে ধীরে পাল্টে হল—কয়লা ধাপে ধাপে।
শক্তি যেটা বাঁধা ছিল গাছপালারই কাছে—
'ফসিল ফুয়েল' নাম নিয়ে সে কয়লা মাঝেই আছে।

সে-কয়লাকে জ্বালছে যখন আগুন এবং বাতাস
'ফসিল' পুড়ে তাপটি যোগায়—শক্তি অবিনাশ' !

ধাঁধা

থাকি জলে খালে বিলে সাগরে ও পুকুরে
খালি চোখে দেখা ভার ক্ষুদে এক' টুকুরে !
গায়ে বালি-জামা মাঝে জ্যামিতিক চিত্র
লেগে যাই নানা কাজে মানুষের মিত্র।
উপাদেয় খাদ্য—যাবতীয় মৎস্যর,
মোরা সব কোটি কোটি লাখো লাখো বৎসর
জমে গিয়ে চাপে তাপে—ধরে রাখি ধাপে ধাপে
পেট্রল কিংবা—লেগে যাই মাপে মাপে
নানা রঙ তৈরীতে আর ডিনামাইটে
ছাঁকনিতে জল ছাঁকা—জীবানুর 'ফাইটে'।
বল দেখি মোর নাম ঠিক চার অক্ষর—
উদ্ভিদ জাতি আমি—পরিচয় তাই মোর।

গত মাসের ধাঁধার উত্তর : ছড়া দিয়েই উত্তর পাঠিয়েছে **কলকাতা-২৫** থেকে **চান্দ্রেয়ী গোস্বামী**।
দেখতো কেমন লাগে ছড়াটা ?

হাঁদা বলে, শোন্ বলি গুণধর দাদা রে,
যে না পারে এই ধাঁধা সে যে শুধু গাধা রে !
একটুকু জ্ঞান যার রয়েছে ফিজিক্‌সে
এ ধাঁধার জবাবটা দিতে পারে ঠিক সে।
জল যত উঁচু হবে জেটিটাও ভাসবে,
মই আর লোকটাও সে-উঁচুতে আসবে।
লোকটা থাকবে তাই ছিল ঠিক যেখেনে
ডোবার প্রশ্ন নেই—উত্তর লিখে নে।
[ধরে নিই, ঢিলে আছে শিক্‌লি সে জেটিটার
নইলে বয়েই গেছে ; যার জেটি ক্ষেতি তার !]

অন্যান্য সঠিক উত্তরদাতাদের নাম :

শীর্ষেন্দু, দিব্যেন্দু ও শুভজিৎ মান্না, হেঁড়্যা ; অরুণ, অনুপ, অলক, অপর্ণা, অঞ্জনা, বিপাশা ও অসীম পাত্র, অমল, রিণ্টু, দীনবন্ধু ও গৌতম, আমতা ; সুব্রত ও কৃষ্ণা ঘোষ, রুচিরা ও অনির্বান গুপ্ত, বি ই, কলেজ ; সৌরেন্দ্র, পার্থ, সুব্রত ও কৃষ্ণা, পায়ড়াডাঙ্গা ; দেবপ্রসাদ দে, সুভাষ প্রামানিক ও গোলোকরঞ্জন দেব ; সৌম্যব্রত বসু ও অরুণ সরকার, প্রদীপ, সন্দীপ, রনদীপ, সর্ব্বানী ও রুমা, কলকাতা ; দীপঙ্কর, দীপান্বিতা, অজয়, ইশিতা ও কংকনা মান্না, অমল ও কমল পাত্র, চাকপোতা ; অভিজিৎ দে, হরিপাল ; সুকান্ত ভট্টাচার্য, শ্রীরামপুর ; সুব্রত পাল, ডালিমগাঁও ; তপতী পাল, রুমা ও লিলি কুণ্ডু, দমদম ; সর্বানী ব্যানার্জী, বৈদ্যবাটী ; মলয়, অমিত, প্রণব, সুব্রত ও উৎপল, পাখিরা ; মোহেবুল, মেসবাহুল, মহাবুবুল ও জাহাঙ্গীর ইসলাম, মহাবুবা, আঞ্জুমোনারা, ও আমিনা খাতুন, বারুইপুর ; সঞ্জীব দুবে, কাঁচরাপাড়া ; চম্পা দত্ত রায়, দঃ চাতরা ; অজয় ও অপূর্ব বিষ্ণু, তাপস চক্রবর্তী, বনগ্রাম ; অনিমেষ, সমরেশ ও জয়দেব হোড়, সঞ্জয় পাল, চন্দন রায় ও রতন বিশ্বাস, মহাদেব, উমা ও বরুণ হোড়, অধিক্রম বিট, গোবরডাঙ্গা ; কেশব পাল, বেলডাঙ্গা।

A WELL WISHER

BIJNAN MELA AUGUST, 1981 Re 1·00

Post Regd WB/SC-200 Regn. No.—R. N. 37306/81

পরের সংখ্যায়....

সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর সংখ্যাকে এক করে শারদীয় বিজ্ঞান মেলা বেরোবে সামনের মাসের গোড়ায়

এতে থাকবে.

হারমণ ম্যাক্সিমভ ও আইজ্যাক অ্যাসিমভের দারুণ চমকদার সায়েন্সফিক্‌সন্ আকর্ষণীয় ৫টি বিজ্ঞান-ভিত্তিক গল্প লিখছেন—

ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য
হীরেন চট্টোপাধ্যায়
বিমলেন্দু মিত্র
অপূর্বেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়
সুভায সান্যাল

সেই সঙ্গে

ইঞ্জিন বিহীন ট্রেন / গান শুনতে গাছও ভালবাসে / যারা ডুব দেয় সাগরে / শব্দের যন্ত্রনা / সাপের যম/প্রাগৈতিহাসিক মাছ এবং আরো বেশ কিছু বিষয় নিয়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানের মজাদার লেখা।

এছাড়া প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'পিঁপড়ে পুরাণ, সূর্যপাড়ি (ছবিতে গল্প), খবর, ছড়া, মনের জানালা, বিজ্ঞানীদের জীবনী, আবিষ্কারের গল্প—এসবতো থাকছেই।

দাম—৩ টাকা

ফুরিয়ে যাবার আগেই যাতে পাও তার জন্য এখনই বই-এর ষ্টলে বলে রাখো।

Published by Mrinal Saha from 8/5, Hingan Jamadar Lane, Cal.-700046 and Printed by Satyanarayan Press, 1, Ramaprashad Roy Lane, Cal.-700006.